BINSHA SHATABDIR BANGLA KABYA, NATAK O KOTHA SAHITYA

MA [Bengali]

BNGL - 803C

Second Semester

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Nirmal Das

Professor of Tripura University

Author: Rintu Das

Copyright © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই-ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বই ম্যাপিং
প্রথম অধ্যায় ঃ আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতার সংজ্ঞা ও লক্ষণ; বোধ; সংবর্ত; বন্দীর বন্দনা (অংশ); ঘোড়সওয়ার; পুনর্বাসন; অবনি বাড়ি আছো; উত্তরাধিকার	একক - ১ (পৃষ্ঠা ১-১৪)
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ নাটক - উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' উৎপল দত্তের নাট্যজীবন; নাটকের কাহিনি-বিন্যাস ; 'টিনের তলোয়ার' ঃ রাজনৈতিক নাটক; প্রথম দৃশ্যে বেণীমাধব ও মেথরের কথোপকথন-এর প্রয়োজনীয়তা; 'টিনের তলোয়ার' ঃ চরিত্র বিচার	একক - ২ (পৃষ্ঠা ১৫-৩৮)
তৃতীয় অধ্যায় ঃ উপন্যাস - সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র; 'জাগরী' উপন্যাসের পটভূমি; 'জাগরী' ঃ রাজনৈতিক উপন্যাস; জাগরী ঃ কারা উপন্যাস; 'জাগরী' ঃ চেতনা প্রবাহরীতির উপন্যাস; 'জাগরী' উপন্যাস ঃ প্রসঙ্গ নামকরণ	একক - ৩ (পৃষ্ঠা ৩৯-৫৮)
চতুর্থ অধ্যায় ঃ বিংশ শতাব্দীর গল্প দিবসের শেষে; ছোট বকুলপুরের যাত্রী; ইঁদুর; আঙুরলতা; আপ ট্রেন; আদার; তৃণভূমি	একক - ৪ (পৃষ্ঠা ৫৯-৭৩)

সূচীপত্র

টিপ্পনী

প্রথম অধ্যায় ঃ আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত (পৃষ্ঠা ১-১৪)

- আধুনিক বাংলা কবিতার সংজ্ঞা ও লক্ষণ
- বোধ
- সংবর্ত
- বন্দীর বন্দনা (অংশ)
- ঘোড়সওয়ার
- পুনর্বাসন
- অবনি বাড়ি আছো
- উত্তরাধিকার

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ নাটক - উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' (পৃষ্ঠা ১৫-৩৮)

- উৎপল দত্তের নাট্যজীবন
- নাটকের কাহিনি-বিন্যাস
- 'টিনের তলোয়ার' ঃ রাজনৈতিক নাটক
- প্রথম দৃশ্যে বেণীমাধব ও মেথরের কথোপকথন-এর প্রয়োজনীয়তা
- 'টিনের তলোয়ার' ঃ চরিত্র বিচার

তৃতীয় অধ্যায় ঃ উপন্যাস - সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' (পৃষ্ঠা ৩৯-৫৮)

- সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র
- 'জাগরী' উপন্যাসের পটভূমি
- 'জাগরী' ঃ রাজনৈতিক উপন্যাস
- জাগরী ঃ কারা উপন্যাস
- 'জাগরী' ঃ চেতনা প্রবাহরীতির উপন্যাস
- 'জাগরী' উপন্যাস ঃ প্রসঙ্গ নামকরণ

টিপ্পনী

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বিংশ শতাব্দীর গল্প **(পৃষ্ঠা ৫৯-৭৩)**

- দিবসের শেষে
- ছোট বকুলপুরের যাত্রী
- ইঁদুর
- আঙুরলতা
- আপ ট্রেন
- আদার
- তৃণভূমি

ভূমিকা

টিপ্পনী

উনিশ শতকের সূচনায় শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা ও গদ্য সাহিত্যের চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রারম্ভ হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মধুসূদন, বিহারীলাল প্রমুখ কবি, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিত গোষ্ঠীর গদ্য-সাহিত্য চর্চা এবং হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্স, প্যারিচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহের উপন্যাস রচনা প্রয়াস ও নক্সা জাতীয় রচনা উল্লেখের দাবি রাখে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমের উপন্যাস ছাড়াও বঙ্কিম অনুসারী সাহিত্যিকদের রচনা পাওয়া যায়। পরে উনিশ শতকের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, প্রবন্ধ নাটক, কথাসাহিত্য রচনা শুরু হয় এবং রবীন্দ্রনাথের একাধিপত্যের মাঝে রবীন্দ্রানুসারী কবি-সাহিত্যিকদেরও আমরা দেখতে পাই।এই শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সাহিত্যিকেরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অবতীর্ণ হলেও পুরনো মূল্যবোধ ও নীতিবোধ একেবারে বিলোপ হয়ে যায় নি। কিন্তু বিশ শতকে এসে উনিশ শতকের মূল্যবোধগুলির বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তাছাড়া দুটি বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা, দেশ বিভাজন, মন্বন্তর, বিভিন্ন আন্দোলন, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম, উদ্বাস্তু সমস্যা, বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক আলোড়ন বাংলা সাহিত্যের দিক্‌বদল ঘটাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশ শতকের বাংলা কবিতা, নাটক, গল্প ও উপন্যাসগুলি সেই সময়ের, সেই সমাজ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপরই রচিত হয়েছে। আমাদের পাঠ্যক্রমভূক্ত বিশ শতকের বাংলা কবিতা, নাটক ও কথাসাহিত্যের (নির্বাচিত) আলোচনাই মূল অন্বিষ্ট।

প্রথম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত

☐ আধুনিক বাংলা কবিতার সংজ্ঞা ও লক্ষণ ঃ

টিপ্পনী

আধুনিক বাংলা কবিতার সংজ্ঞা নিরূপন সম্ভব নয়। আধুনিক বাংলা কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশকালে ১৯৫৩-তেও অর্থাৎ আধুনিক কাব্য আন্দোলন শুরু হওয়ার প্রায় পঁচিশ বছর পরেও বুদ্ধদেব বসু তাই আধুনিক কাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয়ে ইতস্তত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"....এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকলভাবে সনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে শুধু ভিন্ন ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়।"

রবীন্দ্রনাথও ইতিপূর্বে বলেছিলেন ঃ

"কাজটা সহজ নয়। কারণ পাঁজি মিলিয়ে মগর্‌নের সীমানা নির্ণয় করবে কে?" তাঁর মতে, নদী যেমন বাঁক নেয়, সাহিত্যও তেমনি গতি বদলায়। "...সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মগর্‌ন। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে।"

আসলে 'আধুনিক' শব্দটাই আপেক্ষিক। শেলি, কীটস্ তাঁদের যুগে আধুনিক ছিলেন, রবীন্দ্রনাথও একসময় আধুনিক ছিলেন বাংলা সাহিত্যে। জীবনানন্দ দাশও মনে করেন, সময়ের দিক থেকে আধুনিক হলেই আধুনিক কবিতা হয় না। তাঁর মতে ঃ

"... নতুন সময়ের জন্যে নতুন ও নতুন ভাবে নির্ণীত পুরোনো মূল্য, নতুন চেতনা ও নতুন ভাবে আবিষ্কৃত পুরোনো চেতনার যে একান্ত দরকার শিল্পে ও জীবনে এ-কালের কোনো-কোনো বাঙালি কবি সেটা বুঝতে পেরেছেন....।"

এগুলোর থেকে স্পষ্টতর ও কাল নির্দেশক সংজ্ঞা দিয়েছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর আধুনিক কবিতা-সংকলনে (১৯৪০) ঃ

"কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তি প্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।"

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলি থেকে আধুনিক বাংলা কবিতার মোটামুটি তিনটি লক্ষণ পাওয়া যায়ঃ

ক) কালের দিক থেকে আধুনিক কবিতা মহাযুদ্ধ-পরবর্তী।

খ) ভাবের দিক থেকে তা রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসী।

গ) সৃষ্টির দিক থেকে তা নবতম সুরের সাধক।

কিন্তু বাংলা কাব্যের আধুনিকতা এই তিনটি সামান্য লক্ষণেই সীমাবদ্ধ নয়। ভাবের দিক থেকে আধুনিক কবিতার কিছু সাধারণ লক্ষণ হলো ঃ

১) নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিক্ষাত

২) বর্তমান জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ

৩) আত্মবিরোধ ও অনিকেত মনোভাব

টিপ্পনী

৪) বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা

৫) ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব।

৬) ফ্রেজার প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক, ও প্ল্যাঙ্ক, বোর, আইনস্টাইন প্রমুখ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীর প্রভাব।

৭) মার্ক্সীয় দর্শনের, বিশেষত সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে নতুন সমাজ সৃষ্টির আশা।

৮) মননধর্মিতা

৯) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে (প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ, ধর্ম) সংশয়।

১০) দেহজ কামনা, বাসনার অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা।

১১) ভগবান ও প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস

১২) রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ ও নতুন সৃষ্টির পথসন্ধান।

শৈলী ও প্রকরণগত লক্ষণ ঃ

১) বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ।

২) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ এবং বিখ্যাত কবিদের কাব্য ও ভাবনা থেকে উদ্ধৃতির প্রয়োগ।

৩) প্রচলিত কবিপ্রসিদ্ধ উপমা ও বর্ণনার বিরলতম ব্যবহার। প্রচলিত কাব্যিক শব্দ, যেমন- ছিনু, গেনু, মনে, হিয়া প্রভৃতি বর্জন।

৪) প্রাচীন উপমা বা শব্দের অভিনব অর্থ প্রয়োগ এবং নতুন চিত্রকল্প সৃষ্টি।

৫) শব্দ প্রয়োগে বা গঠনে মিতব্যয়িতা ও অর্থঘনত্ব সৃষ্টির চেষ্টা।

৬) নামবাচক বিশেষ্য, বহুপদময় বিশেষণ, অব্যয় এবং ক্রিয়ার পূর্ণরূপের ব্যবহার। চলতি ক্রিয়াপদের সঙ্গে সংস্কৃতবহুল বিশেষ্য বা বিশেষণের সংযোগ।

৭) গদ্যছন্দের ব্যবহার।

৮) ব্যঙ্গ, বিতর্ক, অদ্ভুত ও বীভৎস রসের বহুল ব্যবহার

৯) শব্দালংকার অপেক্ষা অর্থালংকারের প্রাধান্য।

১০) বিষয়বৈচিত্র্য।

বোধ
জীবনানন্দ দাশ

টিপ্পনী

'বোধ' কবিতার প্রথম স্তবকে দেখি, কবি সেই চৈতন্যের কথা বলেছেন, যে চৈতন্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জগতের পর্দা সরিয়ে দিয়ে পরাবাস্তব জগতে প্রবেশ করে। আর তখন তিনি উপলব্ধি করেন, চেনা জগতটা যেন অচেনা হয়ে গেছে। প্রথম স্তবকেই আমরা পাই কবির ভিতরে এক শূন্য বেদনা-বোধ। শুরুতেই দেখি কবির মনের ভিতর একটা বিপন্ন বিস্ময় জমা হতে - যা সৃষ্টির তাড়নায় কবিকে করে তোলে বিষাদে ভারাক্রান্ত ঃ

"স্বপ্ন নয় - শান্তি নয় - ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
আমি তারে পারি না এড়াতে।"

এখানে কবির অন্তরে যে-এক বোধের জন্ম হচ্ছে, কবি কিছুতেই তাকে এড়িয়ে যেতে পারছেন না। অদৃশ্যে থেকেই সে কবিকে টানছে। কবি নিজেই সে-কথা বলতে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হন - 'সে আমার হাত রাখে হাতে;'- এবং সেই বোধের জন্মের জন্যই কবির কাছে বর্তমান হয়ে ওঠে অসহ্য। কবির মনের ভিতরে সৃষ্টি হয় এক বেদনাময় সীমাহীন শূন্যতা। কবির ভাষাতেই তা বেশ স্পষ্ট ঃ

"সব কাজ তুচ্ছ হয়, - ভন্ড মনে হয়,
সব চিন্তা-প্রার্থনার সকল সময় শূন্য মনে হয় -"

মহাশক্তির বোধের কাছেই কবির অসহায়তার রূপ এখানে প্রত্যক্ষ। কবি তাই পুণরায় বলতে বাধ্য হন ঃ

"সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে!
কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে
সহজ লোকের মতো; তাদের মতন ভাষায় কথা কে বলিতে পারে আর!"

কবির পক্ষে কখনোই সম্ভবপর হয়ে ওঠে না সহজ লোকের মতো হাঁটা ও কথা বলা। যে বিশ্বাসে ভর করে কবি খুব সহজে খুঁজে নিতে পারেন শরীরের স্বাদ-আহ্লাদ। বিশ্বাস রাখতে না পারার জন্যই কবি-কন্ঠে শোনা যায় আক্ষেপ ঃ

"শরীরের স্বাদ
কে বুঝিতে চায় আর? -প্রাণের আহ্লাদ
সব লোকের মতো কে পাবে আবার!"

কবিকে হাঁটতে হয় পরাজাগতিক বোধের সঙ্গে সঙ্গে। কবি হয়ে যান অন্য এক জগতের

জীব। পৃথিবীর সমস্ত আলোর জগৎটাই কবির কাছে হয়ে পড়ে অর্থহীন। কবি শেষ পর্যন্ত একই কথার পুণরাবৃত্তি করে বলতে বাধ্য হন ঃ

"স্বপ্ন নয়-শান্তি নয়-কোন এক বোধ কাজ করে মাথার ভিতরে।"

কবি যতই পরাজাগতিক সেই বোধকে পাশ কাটিয়ে চলতে যান, ততই সেই বোধ গভীরভাবে কবিকে চেপে ধরে কোনোভাবেই কবি তা থেকে মুক্তি পান না। পরের স্তবকেই কবি বলেন ঃ

টিপ্পনী

"পথ চ'লে পারে-পারাপারে
উপেক্ষা করিতে চাই তারে;
মড়ার খুলির মতো ধ'রে
আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে
তবু সে মাথার চারিপাশে-"

কবির দু'চোখের ঘুম ঘুচে যায়, নষ্ট হয় জীবনের সব সুখ ও আনন্দ। এমনকি কবি যখন চলার পথে চলতে গিয়ে নিজে থামেন, তখন সেই পরাজাগতিক বোধও থেমে থাকে। অর্থাৎ কবি যখন কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে যান, তখনই সেই বোধ তাঁর মস্তিষ্কের ভিতর শুরু করে দেয় ক্রীড়া আর সেই বোধকে সঙ্গে নিয়ে চলার জন্যই কবি হয়ে পড়েন সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন। আর কবি তাই বলে ওঠেন ঃ

"সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?"

এর পরেই দেখি, কবি গোলক বাঁধার মধ্যে পড়েন, নিজেকে কিছুতেই মিলিয়ে নিতে পারেন না পৃথিবীর সাধারণ মানুষের সঙ্গে। যেমনভাবে মানুষ পৃথিবীতে সন্তান হয়ে জন্মে পিতৃত্বের অধিকারী হয়ে সন্তান জন্ম দেয় এবং সংসার জীবনে রেখে যায় অনেক অক্ষয় কীর্তি - ঠিক এভাবে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত জীবনমাত্রায় ভর করে কবি চলতে পারেন না। কবির ভিতর সব সময় এক সংশয় জন্ম নেয়। কবি তাই পারেন না বাস্তবে সকল মানুষের মতো একাত্ম হয়ে চলতে। কবি হয়ে যান সম্পূর্ণ একাকী, বোধ করেন এক নিদারুণ একাকীত্ববোধের শূন্যতা। কবির মনে তাই দেখা দেয় এক জীবন-জীজ্ঞাসা ঃ

"তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় নাকি? তাহাদের মন
আমার মনের মতো না কি?"

পরের স্তবকে দেখি কবি কিছুতেই পারেন না সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে। কিন্তু কবির একাত্মবোধের স্বপ্ন ছিল। চাষীর লাঙলের সঙ্গে কাস্তের যে সম্বন্ধ, তা কবি উপলব্ধি করেছেন ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিতে, যা কবির কাছে খুবই পরিচিত। কিন্তু তবু কবি কিছুতেই তাদের মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করতে পারেন নি। সব স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ মেখেও কবিকে সব ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে অন্য এক জগতে, যা কবির কাছে মস্ত বড়ো এক ট্র্যাজেডি। আর সেই পরাজাগতিক বোধের কাছে কবি যেন নিতান্তই একজন যন্ত্রী। কবির খেদোক্তিতে তা ধরা পড়ে ঃ

"এক দিন;
এই সব সাধ
জানিয়েছি একদিন-অবাধ-অগাধ;
চ'লে গেছি ইহাদের ছেড়ে;"

বুদ্ধদেব বসুর মতো কবি জীবনানন্দ নারীর প্রতি অনুরাগ-বিরাগ নিয়ে কাব্য রচনা করার কথা ভাবেননি। নারীকে তিনি বরাবরই অন্যচোখে দেখেছিলেন। নারীকে পর্যবেক্ষণ করেছেন কখনো ভালোবেসে, কখনো তাচ্ছিল্য-অবহেলা করে, কখনো বা ঘৃণায়। তাই তিনি বলতে পেরেছেন ঃ

টিপ্পনী

"ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;"

কবি শেষ পর্যন্ত সম্পৃক্ত হতে পারেননি নারীদেহের সংরক্ত ভালোবাসার অমৃত মন্থনে। নারীর নিছক দৈহিক ভালোবাসা কবির কাছে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। তাই কবি পথের ধুলো-কাদার মধ্যে ভালোবাসাকে মাখামাখি হতে দেখেন ঃ

"তবু এই ভালোবাসা-ধুলো আর কাদা -"

ভালোবাসার ইন্দ্রিয় ঘন রূপ কবিকে স্পর্শ করতে পারেনি। যা কবি-মনকে নিয়ে যেতে পারে এক ইন্দ্রিয়জলোকের সুখ-স্বর্গে। কবি অকপটে স্বীকার করেছেন ঃ

"মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়-প্রেম নয়-কোনো এক বোধ কাজ করে।"

অন্য এক বোধই শেষপর্যন্ত কবিকে আলোদা করে ফেলে। এবং সেই বোধই কেড়ে নেয় কবির চোখের ঘুম, সুখ-স্বপ্ন ও শান্তি। সেই বোধই অপমৃত্যু ঘটায় কবির মনের অনেক সুখ-সাধ ও ইচ্ছাকে। কবি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না নিজের একাকীত্বকে। একাকীত্বের ভিতরেও কবি যে কত বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে সচেতন, তা উপলব্ধি করা যায়। কবির কথাতেই বোঝা যায় মানুষ, শিশু ও প্রকৃতির প্রতি কবির আন্তরিক টান। তাদের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে না পারার জন্য কবির ভিতরে দুঃখ ও ক্ষোভ জমা হতে থাকে। কবির ভাষাতেই তা স্পষ্ট ঃ

"কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি? পাবে না আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন!
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন!
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন!"

এরপর কবিতার শেষ স্তবকে দেখি, কবি যে প্রাণের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে একদিন নিজের মনকে সবুজ রঙে রাঙিয়ে ছিলেন, সেই মনেরই 'বোধ' কবিতায় ঘটেছে অপমৃত্যু। তাই শেষ স্তবকে পাই কবির জীবনের প্রতি অতৃপ্তিজনিত বীতরাগ। দেহ ও মনের বেদনাতুর আঘাতের

টিপ্পনী

অসহ্য যন্ত্রণা ঃ

"চোখে কালশিরার অসুখ
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ-গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্টশসা পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
-সেই সব।"

এখানে কবি-হৃদয়ের অক্ষমতার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। সৃষ্টি ও ধ্বংস একই হাতের খেলায়। কবি তাই শেষপর্যন্ত জীবনকে সহজবোধের সঙ্গে সহজ মৃত্যুর মতো মেনে নিয়েছেন। তবে সেই বোধের কাছে নিঃসঙ্গ অসহায়তা বোধ করলেও কবি কিন্তু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন একজন প্রকৃত জীবন-প্রেমিকরূপে। আর এজন্যই কবির ভিতরে শেষপর্যন্ত তা না হতে পারার জন্যই রয়ে গেছে এক গভীর অতৃপ্তিবোধ যা কবিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। আর এই কারণেই 'বোধ' কবিতায় দেখি কবি-মনের নানা বৈপরীত্যের সুর।

সংবর্ত
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'উত্তরফাল্গুনী'র এক যুগ পরে সুধীন্দ্রনাথের পঞ্চম কাবগ্রন্থ 'সংবর্ত'-এর প্রকাশ। ১৯৪০-এ বেরিয়েছিল 'উত্তরফাল্গুনী', ১৯৫৩ সালে বেরোল 'সংবর্ত'। এই সুদীর্ঘ্য বারো বছরের অজ্ঞাতবাসের পরে দেশকালের সঙ্গে সঙ্গে কবিজীবনেও যুগান্তর ঘটে গেছে। এই কালসীমার মধ্যে কবির ব্যক্তিজীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো 'উত্তরফাল্গুনী' প্রকাশের তিন বছরের মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ। 'সংবর্ত'-এর প্রথম কবিতাগুচ্ছ ১৯৩৮ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে লেখা। ১৯৪৫ সালে লেখা মাত্র দুটি কবিতা। বাকিগুলি লেখা ১৯৫৩ সালে। সংবর্তের অর্থ 'কল্পান্ত' বা 'মহাপ্রলয়' অথবা 'প্রলয়ের মেঘ'। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নান্দীমুখ থেকে ভরতবচন পর্যন্ত এই সংকলনের আলম্বন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, 'সংবর্ত' ও 'দশমী'র কবি যেন আরেক সুধীন্দ্রনাথ। এই দু-খানি কাব্যগ্রন্থে প্রেমের কবিতা একটিও নেই। 'অর্কেস্ট্রা' ও 'ক্রন্দসীর' সঙ্গে 'সংবর্ত' ও 'দশমী'র এত তফাত যে মনে হয় কবির গোত্রান্তর হয়েছে। প্রতীকী ভাষণে উত্তরণ ছাড়া কবির শেষ দুটি কাব্যে কোনো নতুন প্রত্যয় বা প্রেরণার পরিচয় পরিস্ফুট হয় নি। কবি নিজেও সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। 'সংবর্ত'-এর 'মুখবন্ধ'টি তারই প্রমাণ। কবি বলছেন, 'আমার লেখায় আধুনিক যুগের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।' 'দ্বিতীয় মহাসমরের কয় বছর আত্মশুদ্ধির অবসর মেলে নি।' 'আমার কাব্যজিজ্ঞাসায় আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য।' কবি অর্ধেক যৌবন অতিবাহিত করে বুঝতে পেরেছেন, 'উচ্ছ্বাস-সংবরণ সাহিত্যসাধনার আদ্যকৃত্য।' এই সাধনায় মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই তাঁর অন্বিষ্ট বলে তিনি মনে করেছেন। মালার্মের মতো তিনিও বিশ্বাস করেন যে, 'কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ।'

'সংবর্ত'-এর কবি স্বধর্মভ্রষ্ট। আভিজাত্যের উচ্চশিখর থেকে তিনি নেমে এসেছেন। সুধীন্দ্রনাথ উত্তর তিরিশের সবচেয়ে অভিজাত কবি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম চৌধুরীর

আসন যে পংক্তিতে সেই পংক্তিতেই সুধীন্দ্রনাথেরও স্থান। পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রেও উভয়েই অভিজাত বংশীয়। কিন্তু মধ্যজীবনে জীবিকান্বেষণে সুধীন্দ্রনাথ আভিজাত্য ভ্রষ্ট হয়েছেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি ইনশিওরেন্স কোম্পানি, এ.আর.পি., দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকতা এবং একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রচারসচিবত্ব করে গোত্রভ্রষ্ট হয়েছেন। সৌভাগ্যবশত ১৯৫৪ সাল থেকে সুধীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত হন। তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনাই তাঁর পরিশীলিত প্রজ্ঞার যোগ্য বৃত্তি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সারস্বত পরিবেশে তিনি তাঁর সহজাত আভিজাত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর সর্বশেষ কাব্যসংকলনে তাঁর পরিচয় পরিস্ফুট।

টিপ্পনী

কিন্তু ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে লেখা 'সংবর্ত'-এ কবি আত্মবিস্মৃত। 'সংবর্ত'-এর প্রথম কবিতাতেই কবিমানসের ঋতুপরিবর্তন লক্ষণীয়। 'বিজনে, নব নীপবনে, পুষ্পিত তৃণদলে' কবি নতুন কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তারই স্বাক্ষর পাওয়া যায় তাঁর কবিতায় ঃ

"শ্যাম সন্ধ্যার পল্লবঘন অলকে
চন্দ্রকলার নন্দনটিকা জ্বলে।"

এই পরিবেশে যখন কবি মুগ্ধনয়নে গান রচনার জন্য কান পেতে আছেন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে গেছে। ভগ্নস্বপ্ন কবি দেখলেন, 'পোড়ে মৌচাক আধিদৈবিক অলাতে'। আর 'কানামাছি উড়ে; ত্রিভুবন জুড়ে কালের ঊর্ণজাল'। অন্যদিকে ঃ

"অশক্য পিতা; বলীর কণ্ঠলগ্ন
মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন;
ক্ষাত্র শোণিতে অবগাহি, জামদগ্ন্য
তবু পাতিবে না স্বর্গরাজ্য ভবে।"

তাই কবি সংকল্প নিতে বাধ্য হলেন ঃ

"স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে
শুদ্ধির তান্ডবে।।"

'অর্কেস্ট্রা'-'ক্রন্দসী'র কবি অবশেষে 'শুদ্ধির তাণ্ডবে' যোগ দেবার কথা চিন্তা করেছেন। আসলে বিংশ শতাব্দীর মানুষের এই নিয়তিই অনিবার্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শিখরাসীন আভিজাত্যের গৌরবকে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়াতেই যুগজীবনের পরিতৃপ্তি। কবিও নিজেকে নাটকের নায়ক-রূপে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু পঞ্চমাঙ্কে পৌঁছে প্রাক্‌নির্বাণ দীপের উদ্ভাসে সমবেত পাত্রপাত্রী যখন নিজ-নিজ বিধিলিপি পাঠ করছে তখন কবি দেখছেন, 'ঘুমন্ত কঞ্চুকী'র ভূমিকাটিই তাঁর জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে।

তবু কল্পান্তের প্রলয়তাণ্ডবে তাঁকেও যোগ দিতে হলো। তাছাড়া অন্ধ হলে যে প্রলয় বন্ধ থাকে না, এ জ্ঞাত তো 'ক্রন্দসী'র কবির বহু পূর্বেই হয়েছিল। 'সংবর্ত'-এ পৌঁছে তিনি বুঝতে পেরেছেন ঃ

"আসন্ন প্রলয় ঃ
মৃত্যুভয়
নিতান্তই তুচ্ছ তার কাছে।"

কবি জেনেছেন,

"নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে
ধূমাঙ্কিত চৈত্যে আজ বীতাগ্নি দেউটি,
আত্মহা অসূর্যলোক, নক্ষত্রেও লেগেছে নিদুটি।"

১৯৩৮ সালের ২৬ অক্টোবর লেখা 'উজ্জীবন' কবিতার এই চেতনাই ১৯৪০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর লেখা 'সংবর্ত' কবিতায় বিশদীভূত হয়েছে। কবি বলছেন ঃ

টিপ্পনী

"গ্যেটে, হোল্ডার্লিন্, রিলকে, টমাস মানের উপন্যাস
দেওয়ালের খোপে-খোপে, বখের সনাটা
ক্লাভিয়েরে, শতায়ু ওকের পাটা
তেজস্ক্রিয় উৎকোণ পটলে;
বায়ব্য অঞ্চলে
রক্ষিত মঙ্গলদ্বীপ, অনাদি নগরী,
মালা জ'পে, কাটায় শর্বরী
স্বপ্নাবিষ্ট সভ্যতার নিশ্চিত শিয়রে।-
লেগেছিল হাস্যকর স্বভাবত সে-সবের পরে
কূটাগার থেকে দেখা স্বস্তিকলাঞ্ছন
বালখিল্য নাট্সীদের সমস্বর নামসংকীর্তন
মশালের ধূমার্ত আলোকে।"

এই প্রলয়ান্তক পরিবেশে কবির মনে হয়েছে 'অন্তর্হিত আজ অন্তর্যামী'। তাই শুদ্ধির তাণ্ডবে যোগদান তাঁর পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। শুদ্ধিমন্ত্র তাঁর জানা নেই। তাই তিনি বলেন ঃ

"প্রনষ্ট পৃথ্বীর প্রান্তে তমিস্রার লজ্জাবস্ত্রে আজ
এসো নগ্ন মনুষ্যত্ব ঢাকি।
রক্তে কিংবা অশ্রুপাতে নিষ্কলঙ্ক হবে না সমাজ।"

তমিস্রার লজ্জাবস্ত্রে নগ্ন মনুষ্যত্বকে ঢাকার প্রয়াস আর যাই হোক প্রাজ্ঞকৃত্য নয়। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত দিনে পঞ্চাশোত্তর কবি অবশেষে আত্মসমীক্ষায় নিমগ্ন হয়েছেন 'সংবর্ত'-এর শেষ পর্যায়ে। ১৯৫৩ সালের ১৮ মার্চ লেখা 'যযাতি' কবিতায় তিনি বলেছেন ঃ

"আমি বিংশ শতাব্দীর
সমানবয়সী, মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে-যুদ্ধে, বিপ্লবে-বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।"

বন্দীর বন্দনা (অংশ)
বুদ্ধদেব বসু

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের যে অধ্যায়কে বলা হয় 'কল্লোল যুগ' সেই অধ্যায়ের তরুণতম প্রতিনিধি ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। সাহিত্যক্ষেত্রে সর্বত্রচারী হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসু সুখ্যাত কবি। তাঁর 'বন্দীর বন্দনা', 'কঙ্কাবতী', 'দময়ন্তী', 'দ্রৌপদীর শাড়ি', 'নতুন পাতা', 'যে আঁধার আলোর অধিক', 'শীতের প্রার্থনা', 'বসন্তের উত্তর', 'মরচে-পড়া পেরেকের গান' - প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁর কবিপ্রতিভাকে ধাপে ধাপে উন্মীলিত ও উজ্জ্বল করেছে। তত্ত্ব হিসেবে তাঁর কবিতা অভিনব না হলেও প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বে বুদ্ধদেব আধুনিক। 'কালের পুতুল' গ্রন্থের নাম প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

টিপ্পনী

"আধুনিক কথাটার সংজ্ঞা যুগে-যুগে বদলায়, অভিনবত্বের আকর্ষণ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী এবং সর্বশেষ-বিচারে বোধহয় এ-কথাই বলতে হয় যে, সেইটাই সত্যিকার আধুনিক, যেটা চিরন্তন।"

এই চিরন্তনকে স্থান-কালের পরিবেশে নতুন করে পরিবেষণ করারই নাম প্রতিভা-শক্তি। বুদ্ধদেব বসু এই অর্থেই প্রেমের কবি হয়েও আধুনিক কবি। 'প্রাণ উদ্বোধনী' 'প্রিয়তমা অগ্নিকল্পা কবিতা-কল্পনা'র সাধনাই 'বন্দীর বন্দনা'র কবির পরম অভিলষিত। কাব্যসাধনা তাঁর উপেয়, প্রেম হলো তার উপায়। কামনার কারাগারে বন্দী শাপগ্রস্ত মানুষের অভিশাপমুক্তির পথ হলো প্রেম। 'অমিতার প্রেম' - কবিতা এই উপলব্ধিরই কাব্যরূপ। কবি বলেছেন, তাঁর প্রতি অঙ্গ পাপের ছাপ লেগে অশুচি পঙ্কিল হয়েছে। নারীর প্রেমেই তাঁর মুক্তিস্নান ঃ

"তুমি মোর মুক্তিস্নান;
একবার তুমি মোরে গাহন করিতে দাও যদি
উঠিয়া আসিবো তবে শুভ্র, সুস্থ, সবল, সুন্দর।
হবো চির-জ্যোতিষ্মান
আকাশের নক্ষত্রের মতো।"

যতদিন এই মুক্তিস্নান না ঘটছে ততদিন কবি নিজেকে বলছেন শাপগ্রস্ত।

নির্মম বিধাতা কবিকে 'প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী' করে রেখেছেন। এই বন্দিদশার বর্ণনায় কবি বলছেন ঃ

"বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্তলাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার-কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি;-"

এই জ্যোতির্হীন বন্দিশালা থেকেই জ্যোতির্ময় স্রষ্টার উদ্দেশে কবি বন্দনা-সংগীত গেয়ে উঠছেন। বলেছেন ঃ

"তুমি মোরে দিয়েছ কামনা, অন্ধকার অমা-রাত্রি সম,
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্নসধা মম।
তাই মোর দেহ যবে ভিক্ষুকের মতো ঘুরে মনে

টিপ্পনী

ক্ষুধা-জীর্ণ, বিশীর্ণ-সংকাল -
সমস্ত অন্তর মম সে-মুহূর্তে গেয়ে ওঠে গান
অনন্তের চির-বার্তা নিয়া;
সে কেবল বার-বার অসীমের কানে-কানে
একটি গোপন বাণী কহে -
'তবু আমি ভালোবাসি, তবু আমি ভালোবাসি আজি!'
রক্ত মাঝে মদ্যফেনা, সেথা মীনকেতনের উড়িছে কেতন,
শিরায়-শিরায় শত সরীসৃপ তোলে শিহরণ,
লোলুপ-লালসা করে অন্যমনে রসনা-লেহন।
তবু আমি অমৃতাভিলাষী!-
অমৃতের অন্বেষণে ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি,
ভালোবাসি-আর কিছু নয়।"

'অন্ধ অমা-রাত্রি সম' কামনার সঙ্গে স্বপ্ন-সুধা মিলিয়ে কবি রচনা করেছেন প্রেমকে। কামনার কারাগারে চিরবন্দী থেকেই প্রেমের এই অমৃত পিপাসায় তিনি সৃষ্টি করেছেন নিজের সারস্বতসত্তাকে। আত্মসৃষ্ট এই সারস্বতলোক থেকেই কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে নিখিল-স্রষ্টার উদ্দেশে 'বন্দীর বন্দনা'। অন্ধ কামের জ্যোতির্ময় প্রেমের এই মিলন-সাধনকেই কবি বলেছেন 'অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে' পৌরোহিত্য। এই মিলন-মন্ত্রেরই অন্য নাম 'বন্দীর বন্দনা'।

ঘোড়সওয়ার
বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে-র দ্বিতীয় গ্রন্থ 'চোরাবালি', 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর প্রায় একই সময়ে লেখা। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে লেখা; আর 'চোরাবালি' ১৯২৫ থেকে ১৯৩৬। 'চোরাবালি'র লার্হস্থ্যপ্রেম শুরু হয়েছে ১৯২৫-এ। তখন কবির বয়স মাত্র ১৬ বছর। 'মন-দেওয়া-নেওয়া' ১৭ বছর বয়সের রচনা। প্রথম কাব্যগ্রন্থে ১৯৩১ সালের রচনাই বেশি; চোরাবালিতে ১৯৩৫ সালের।

'চোরাবালি'র সবচেয়ে বিতর্কিত কবিতা 'ঘোড়সওয়ার'। ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন ঃ

"যাঁদের কাছে য়ুং প্রমুখ পুরাণবিদেরা নামমাত্র, তাঁরাও বুঝবেন যে, চোরাবালি আর ঘোড়সওয়ার শুধু রিরংসার রূপক নয়, তাদের উপরে প্রকৃতি-পুরুষ ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধারোপ সহজ ও শোভন।"

'রিরংসা' কথাটি সুধীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যবহার করলেন। য়ুং-এর উল্লেখও প্রথম তিনিই করলেন। রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে বলেছেন (১১ এপ্রিল, ১৯৩৯) ঃ

"একটা সংশয় তাঁর (সুধীন্দ্রনাথের) আশ্বাস সত্ত্বেও রয়ে গেল। তিনি বলেছেন, এই কবিতাটির অবলম্বন রিরংসা নয়। ...সুধীন্দ্র সংশয়কে নিরস্ত করতে গিয়েই তাকে জাগিয়ে

দিলেন। কাব্য হিসাবে এর গুণপনা আছে, কিন্তু শ্রাব্য হিসাবে এটা আমার কাছে বহুদূরে বর্জনীয়। ...অত্যন্ত রিরংসার বাস্তব চিত্রের অভিযোগ বাঁচাবার জন্যে সুধীন্দ্র এর মধ্যে প্রকৃতি পুরুষ ও ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ করেছেন। মেলাতে পারলুম না।"

রবীন্দ্রনাথ 'কাব্য হিসাবে' এর গুণপনার কথা বলেছেন, কিন্তু 'শ্রাব্য হিসাবে' তাঁর নীতিবোধে বেধেছে। আধুনিক কাব্যরসিকের সে বালাই নেই। তবে সুধীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-পুরুষ বা ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপও হাস্যকর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। গ্রন্থের নাম, 'চোরাবালি'। এই নামকরণের গূঢ়ার্থ বিশ্লেষণ করলেও কবির অভিপ্রেত অর্থের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কেউ কেউ মনে করেছেন, এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' বোঝাতে 'চোরাবালি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।। কিন্তু কাব্যরসের অঙ্গিরস হলো শৃঙ্গাররস - তাই 'ঘোড়াসওয়ার'কে কেউ কেউ 'ফার্টিলিটি কাল্ট'-এর প্রতিমারূপে গ্রহণ করেছেন। কবিতার শুরুতে আছে ঃ

টিপ্পনী

"জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি-
কোথায় ঘোড়সওয়ার?"

এই আহ্বানের তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে কবিতার মধ্যভাগে ঃ

"কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো।
কামনার টানে সংহত গ্লোসিয়ার।
হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে দূরদেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার!"

এই 'বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার'ই কবিতার অন্তিবে হয়েছে পুরুষকার। 'চোরাবালি' বলছে, 'কোথায় পুরুষকার? / অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?' - এই বিশ্লেষণে মিথুনলীলার রহস্যই আভাসিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

"বিষ্ণু দে-র কবিত্বশক্তি আছে কিন্তু তাকে মুদ্রাদোষে পেয়েছে, - সেটা দুর্বলতা। বিদেশী পৌরাণিক বা ভৌগোলিক উপমা কোনো বিশেষ কবিতার অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতায় আসতেও পারে, কিন্তু এগুলি প্রায়ই যদি তাঁর রচনায় পরিকীর্ণ হয়ে আচমকা হুঁচট লাগাতে থাকে তবে বলতেই হবে এটা জবরদস্তি।"

পুনর্বাসন
শঙ্খ ঘোষ

শঙ্খ ঘোষের কবিতা আত্মসচেতন উন্মুখতার কবিতা হলেও সেখানে সমাজচেতনা অনুপস্থিত নয়। দেশত্যাগের যন্ত্রণা, স্বাধীনতা, নিদারুণ সামাজিক অভিজ্ঞতা, রাষ্ট্রীয় উৎপীড়ন, ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিলে পুলিশের আক্রমণ, মানুষ খুন ইত্যাদি তাঁকে উত্তীর্ণ করে দেয় মানবিকবোধে।

দিগন্তকে স্পর্শ করে ব্যক্তিক জীবনসাধনার সঙ্গে সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনাকেও একই স্রোতধারায় মেলাতে উৎসাহী। পঞ্চাশের অপরাপর কবিদের ন্যায় শঙ্খ ঘোষ রোমান্টিকতার জগতে আশ্রয় গ্রহণ করে বা যৌবনের বেদনার গানে অথবা রোমান্টিক প্রেমের তীব্র আকাঙ্খার জগতে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চান নি।

টিপ্পনী

তাঁর কবিতায় শব্দগত চটুলতা নেই, হাল্‌কা চাল নেই- আছে সহজ-গভীর এক বোধ। তাঁর কবিতার জীবনবোধের মহান গভীরতা থাকে বলেই তা সামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়ে ঝলসে ওঠে। সেই সঙ্গে দুঃখের নিবিড় বিষাদে বেদনাবিধুর হয় আর যৌবনের অনির্বাণতায় মুগ্ধ কান পাতে। কবিতা তাঁর কাছে পাণ্ডিত্যের বহিঃপ্রকাশ নয় সংক্রান্তির বেদনার্ত অভিজ্ঞান; মহনীয় চেতনায় প্রবেশের চাবিকাঠি; অনুজ্জ্বল জগতাভিসারী থেকে উজ্জ্বল জগতের মানবচেতনার গায়ত্রীমন্ত্র। তাঁর কাব্যপংক্তির আড়ালে চাপা আবেগ, নিষ্ঠুরতা ও প্রেমের এক তীব্র সঞ্চার সতর্ক পাঠকের কাছে অসামান্য আধুনিকতার দীপ্তি পায়। দ্বন্দ্ব ও আঘাতময় জীবনবোধের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়েছে কবির ইতিহাস চেতনা।

তাঁর 'পুনর্বাসন' কবিতায় বাস্তুহারা মানুষের জীবন-যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠেছে। 'যা কিছু আমার চারপাশে ছিল' বলে কবিতাটি আরম্ভ হয়েছে। এখানে স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে ঘাসপাথর, সরীসৃপ, ভাঙা মন্দির, নির্বাসন, কথামালা, সূর্যাস্ত, ধ্বস, তীরবল্লম, ভিটেমাটি। স্মৃতির যাত্রাপথ ধরে কবি পৌঁছে যান বর্তমানের বাস্তুহীনতার অনুষঙ্গে। সুখ-স্বচ্ছন্দময় জীবনে হঠাৎ নেমে আসে ভয়বহতা। মূল ছিন্ন হলেও কিছু যেন থেকে যায় অবশিষ্ট। আর তাই, 'এক পা ছেড়ে অন্য পায়ে সব বাস্তুহীন' হয়ে যায়। বাস্তুহার জীবনের ভয়াবহতা কবি নিজের চারপাশের অভিজ্ঞতাময় জীবনের মধ্যে অনুভব করেন। বেশ কিছু শব্দের মধ্য দিয়ে সেই ভয়ানক জীবন-পাঁচালিকে উপস্থাপন করেছেন কবি। শব্দগুলি হলে! শেয়ালদা, ভরদুপুর, উলকি-দেয়াল, কানাগলি, স্লোগান, মনুমেন্ট, শরশয্যা, ল্যাম্পোস্ট, লাল গঙ্গা। এই সমস্তকিছুকে উপেক্ষা করে সময় বয়ে যায়।

কবির চারপাশে শুধু ভয়াবহতা নেই - আছে রোমান্টিক ও সুখময় ঘটনাপ্রবাহ। তাকেও কবি কতগুলো শব্দের মধ্যে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেমন ঃ উড়ন্ত চুল, উদোম পথ, ঝোড়ো মশাল, ভোরের শব্দ, স্নাত শরীর, শ্মশানশিব। আবার প্রাত্যহিক, আবহমান, জীবন ও মৃত্যুও কবির চারপাশে খেলা করে। এই সবকিছুই স্মৃতির পথ ধরে ঘুরে আসে। বাস্তু ও বাস্তুহীনতা অর্থাৎ যা ছিল ও যা আছে - এই দ'য়ের প্রবহমানতায় ছিন্নমূল মানুষের জীবন-যাপনের অর্থাৎ পুনর্বাসনের সংগ্রামময় জীবনের স্মৃতিভাষ্য রচিত হয়ে যায়।

অবনি বাড়ি আছো
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চাশের দশকে যাঁর কবিতায় রোমান্টিকতা, উদ্দামতা, নতুন ভাবে কথা বলার স্পর্দ্ধা পাঠকের মনোহরণ করেছিল তিনি হলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। নারীর প্রতি প্রেম বা প্রেমের প্রতি আকাঙ্ক্ষা শক্তির কবিতার মূল বিষয় হলেও মানুষের জন্য অসম্ভব এক ক্ষমতা এবং অনুরাগ মিশ্রিত আবেগও তাঁর কবিতার উল্লেখযোগ্য বিষয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি হলো ঃ 'হে প্রেম', 'হে

নৈঃশব্দ', 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো', 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' ইত্যাদি।

তাঁর 'মানুষ বড় কাঁদথে' প্রভৃতি পংক্তির মধ্যে মানুষের জন্য যন্ত্রণার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতাতেও সেই যন্ত্রণাকাতর হৃদয়েরই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। কবিবন্ধু অবনীর বাড়িতে কড়া নেড়ে তাঁকে ডাক দেওয়া 'অবনী বাড়ি আছো?' – এ ডাক সার্বিক মানুষের যন্ত্রণাকাতর ও নিঃসঙ্গ হৃদয়ের ডাকে পর্যবসিত হয়েছে। যন্ত্রণাহত মানুষের ডাককে শোনার জন্য কান পেতে রাখা আধুনিক কবিতায় সম্পূর্ণ নতুন এক জীবনদর্শনের মাত্রা যোগ করেছে। এই মাত্রাই আরো ঘনীভূত হয়েছে শেষ চারটি পংক্তিতে ঃ

টিপ্পনী

"আধেকলীল হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়া নাড়া
অবনী বাড়ি আছো?"

উত্তরাধিকার
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আদ্যন্ত রোমান্টিক কবি। তাঁর কবিতার প্রধান আশ্রয়-ই হলো নারী এবং প্রেম। তাঁর কাব্যের 'নীরা' এক রহস্যময়ী চিরপ্রেমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হলো ঃ 'আমি কিরমভাবে বেঁচে আছি', 'বন্দী জেগে আছো', 'আমার স্বপ্ন', 'দেখা হলো ভালবাসা বেদনায়' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি অস্বীকার করে একদম নিজস্ব ভঙ্গিতে রোমান্টিসিজম্‌কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি।

আমাদের আলোচ্য 'উত্তরাধিকার' কবিতায় কিন্তু কবির নিজের কৈশোর-জীবনের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির স্মৃতি-চিত্র ফুটে উঠেছে। কিশোরের যে ধর্ম কবি-জীবনে সুখস্মৃতি হয়ে আছে তাঁর উত্তরাধিকার দিয়ে যেতে চেয়েছেন ভবিষ্যতের নবীন কিশোরের হাতে। আর সেই উত্তরাধিকার-সূত্রে যা যা কবি দিতে চান সেগুলি হলো ঃ 'ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ', 'বোতামবিহীন ছেঁড়া শার্ট' ও 'ফুসফুস-ভরা হাসি'। কিশোরের ধর্ম হলো দুপুর রোদে পায়ে পায়ে ঘোরা, রাতে মাঠে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা – যেগুলো কবিও একদিন উপভোগ করেছেন। তাঁর সেইসব যাপিত দিনগুলি, তাঁর দুঃখবিহীন দুঃখ, ক্রোধ, শিহরন-সবই ভবিষ্যতের নবীন কিশোরের হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন। কবির কৈশোরের আরও কিছু অভিজ্ঞতা – 'জ্বলন্ত বুকে কফির চুমুক', 'সিগারেট চুবিণ', 'জানালার পাশে বালিকার প্রতি একবার ভুল পুরুষ বাক্য', 'কবিতার প্রতি প্রেম', 'আত্মহলন', 'অহংকার' প্রভৃতি তিনি কিশোরের হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন। এছাড়াও তাঁর একটি নদী, দু'তিনটে দেশ কয়েকটি নারী – সমস্ত কিছু তাঁর একদিন প্রিয় ছিল – কিন্তু মধ্য বয়স পেরিয়ে তা আর তাঁকে মানায় না – সব কিছুই নবীন কিশোরের হাতে অর্পণ করে কবি বলেছেন ঃ "ইচ্ছে হয় তো অঙ্গে জড়াও / অথবা ঘৃণায় দূরে ফেলে দাও...."।

টিপ্পনী

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাটক - উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার'

☐ উৎপল দত্তের নাট্যজীবন ঃ

টিপ্পনী

উৎপল দত্তের জন্ম ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ। পিতার নাম গিরিজারঞ্জন দত্ত ও মাতা শৈলবালা দত্ত। পিতৃদত্ত নাম উৎপলরঞ্জন দত্ত। তাঁর ডাক নাম ছিল শঙ্কর। মৃত্যু ঃ ১৯৯৩ সালের ১৯ আগস্ট।

সরকারি চাকরি সূত্রে পিতাকে নানা জায়গায় থাকতে হয়েছে। তাই প্রথমদিকে শিলঙ, বহরমপুর হয়ে পরে কোলকাতায় পড়াশোনা শুরু করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৪৯ সালে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি.এ পাস করেন। স্কুলে থাকতেই নাটকের সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরি হয়। কলেজ জীবনে সেক্সপিয়রের নাটক পাঠ এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া হেগেল, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন প্রমুখ দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হন। ইংরেজি ভাষা ছাড়াও তিনি ফরাসি, ল্যাটিন, জার্মান এবং বাংলা ভাষায় স্বচ্ছন্দ ছিলেন। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গসংগীত ও পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতেও তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন।

১৯৪৭ সালের জুন মাসে কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় 'দ্য অ্যামেচার সেক্সপিয়রিয়ান্স' নামে নাট্যদল গড়ে তোলেন। এই নাট্যদলের প্রাণপুরুষ ছিলেন উৎপল দত্ত। সব নাটকই অভিনীত হতো ইংরেজি ভাষায়। এবং বেশির ভাগ নাটকই ছিল শেক্সপিয়রের। 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়ট', 'ম্যাকবেথ', 'রিচার্ড দি থার্ড', 'ওথেলো', 'মিডসামার নাইটস ড্রিম', 'জুলিয়াস সিজার' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হতো।

নিজের নাট্যদল অভিনয় করতে করতে তার জীবনে এক বড়ো সুযোগ এসে গেল। ১৯৪৭ সালে কোলকাতায় আসেন বিখ্যাত ব্রিটিশ নাট্যপ্রযোজক জিওফ্রে কেন্ডাল ও তার স্ত্রী লরা কেন্ডাল। তাদের পেশাদারি নাট্যদল 'দি শেক্সপিয়রিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানী'র পরিচালক ও অভিনেতা ছিলেন কেন্ডাল। শেক্সপিয়রের নাট্যাভিনয়ে তাদের জগৎজোড়া খ্যাতি। কোলকাতার অভিনয়ে কেন্ডাল স্থানীয় কয়েকজন অভিনেতাকে তাঁর দলে গ্রহণ করেন। উৎপল দত্তের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিজের দলে নিয়ে এলেন কেন্ডাল।

কেন্ডালের সঙ্গে থেকে উৎপল অভিনয়ের নানা দিক এবং প্রযোজনা ও পরিচালনার বিভিন্ন দিক শিখে নেন। সেখানে শুধু শেক্সপিয়র নয়, আরও অন্যান্য নাট্যকারের নাটকেও তিনি অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। মেকআপ, কণ্ঠস্বরের ওঠা নামা, দেহের ব্যায়াম, তলোয়ার খেলা প্রভৃতি তিনি শিখে নেন।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ১৯৪৮ সালে। অনেক কর্মী সংগঠক ও নেতা কারারুদ্ধ হন। ১৯৫০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কোলকাতা হাইকোর্টের রায়ে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে পার্টিকর্মীরা মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কাজকর্ম, নাট্যাভিনয় এবার দ্বিগুণ উৎসালে পুনরায় শুরু হয়। ততদিন

উৎপল সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় নিজেকে অনেকটা তৈরি করেছেন। অভিনয় করছেন সমাজতান্ত্রিক ভাবনার নাটক অভেটস-এর 'ওয়েটিং ফর লেফটি' এবং 'টিল দ্য ডে আই ভাই'। ভারতীয় গণনাট্য সংঘও তাঁকে আমন্ত্রণ জানায় তাদের বিজয়োৎসবে স্পার্টা গ্রাউন্ডে নাট্যাভিনয়ের জন্য। এরপরই উৎপল সক্রিয়ভাবে গণনাট্য সংঘে যোগ দেন তাঁর ভাষায় ঃ 'শুরু হলো নাটকের মাধ্যমে মানুষের কথা তুলে ধরা।'

টিপ্পনী

মধ্য কলকাতার গণনাট্য শাখায় যোগ দিয়ে উৎপল সেখানে নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। তিনি যখন গণনাট্য সংঘে আসেন, তখন গণনাট্য সংঘের অনেকেই সংঘ ছেড়ে বেরিয়ে নিজেদের দল তৈরি করা শুরু করে দিয়েছেন। এই সময় তিনি পানু পালের 'ভাঙাবন্দর' নাটকে স্মাগলার গজানন-এর চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেন। নিজের লেখা পোস্টার ড্রামা 'পাসপোর্ট', রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'-এ গোবিন্দমাণিক্যের ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'বিসর্জন' পরিচালনাও করেছিলেন। এ ছাড়া গণনাট্য সংঘের হয়ে ম্যাকবেথ, অফিসার, দলিল, চার্জশিট প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন। কোনো কোনোটি পরিচালনাও করেন। এই সময়ে অনেক পথনাটকেও তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। গণনাট্য সংঘে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেন রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন', গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদৌল্লা', মধুসূদনের দুটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে বোঁ', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু'। শুধু পরিচালনা নয়, এগুলির বিভিন্ন চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয়ও করেছেন।

১৯৫১-৫২ সালের মধ্যে তিনি মোটামুটি দশমাস গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সময়ের উপলব্ধির কথা জানাতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

"গণনাট্য সংঘ আমাকে জনতার মুখরিত সখ্যে নিয়ে গেল। একটা ঘুম ভেঙে গেল। একটা আলোকিত জাগরণে মেতে উঠলাম।"

গণনাট্য সংঘ ছেড়ে চলে এলেও তিনি কখনোই গণনাট্যধারা বা আদর্শের প্রতি বিরূপ হননি। এ দেশ ও বিদেশের মহান গণনাট্য আন্দোলনের প্রতি তিনি শেষদিন পর্যন্ত শ্রদ্ধা ও আস্থাশীল ছিলেন। স্কুল-কলেজে নাটকপাঠ ও নাট্যশিক্ষা এবং অভিনয় তাকে নাট্যজগতে প্রবেশ করিয়েছিল। এর সঙ্গে শেক্সপিয়রের নাটক তাকে নাটকের ভাবনায় আকৃষ্ট করে এনেছিল এবং জিওফ্রে কেন্ডাল দক্ষ গুরুর মতো তাকে নাট্যপ্রযোজনার পাঠ দিয়েছিলেন। নিজেকে পুরোপুরি 'থিয়েটারওয়ালা' হিসেবে প্রস্তুত করেই উৎপল দত্ত থিয়েটারের জগতে শামিল হয়েছেন। গণনাট্য সংঘ ছেড়ে বেরিয়ে এসে উৎপল তার লিটল থিয়েটার গ্রুপে পুরোপুরি বাংলাভাষায় নাটকাভিনয় শুরু করেন। সেইসব নাটকের বিষয়বস্তু হতে লাগল তাঁর মতবাদ, চিন্তা, চেতনা ও আদর্শ অনুযায়ী।

পুরোপুরি বাংলাভাষায় প্রথম অভিনয় 'সাংবাদিকতা' এক রুশ নাটকের বঙ্গানুবাদ। এরপর 'ডলস্ হাউস'-এর অনুবাদ 'পুতুলের সংসার'। পরে একে একে 'অচলায়তন', 'প্রফেসর মামলক', 'কেরানি' ইত্যাদি। এছাড়াও 'ম্যাকবেথে'র বাংলা রূপান্তর, রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা', 'গুরু বাক্য', 'সূক্ষ্ম বিচার', 'তপতী' প্রভৃতিরও অভিনয় হয়েছিল। সেইসঙ্গে 'সিরাজদৌল্লা', 'নীচের মহল', 'ওথেলো', 'ছায়ানট' প্রভৃতিও অভিনীত হয়েছিল। 'ছায়ানট' উৎপলের প্রথম বাংলায় মৌলিক নাটক রচনা। এর আগে মূল ইংরেজি নাটক, ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ এবং অন্যান্য নাট্যকারদের বাংলা নাটকের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন

করে উৎপল পুরোপুরি পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক রচনায় হাত দেন ১৯৫৮ সালে।

কোলকাতার বাণিজ্যিক পেশাদারি থিয়েটার হল 'মিনার্ভা' লীজ নিয়ে সেখানে উৎপল দত্তের পরিচালনায় লিটল থিয়েটার গ্রুপ ধারাবাহিকভাবে নাট্যাভিনয় শুরু করে ১৯৫৯ থেকে। প্রথম দিকে 'ওথেলো', 'ছায়ানট', 'নীচের মহল' অভিনয় করা হলো। তারপর 'অঙ্গার'। পরপর অভিনীত হলো 'ফেরারী ফৌজ', 'ঘুম নেই', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'কল্লোল', 'তীর', 'মানুষের অধিকারে', 'যুদ্ধং দেহি', 'ক্রুশবিদ্ধ কুবা', 'লেনিনের ডাক' ইত্যাদি। ১৯৬৯ সালে লিটল থিয়েটার গ্রুপ ভেঙে যায়। ফলে 'মিনার্ভা'ও ছেড়ে দিতে হয়। উৎপল দত্ত এবার খুললেন যাত্রাদল। বিবেক নাট্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করে ভিন্নতর অভিজ্ঞতা ও নতুনতর পথসন্ধানের প্রচেষ্টার রত ছিলেন উৎপল। ১৯৬৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর প্রথম যাত্রাপালা অভিনয় করেন 'শোনরে মালিক'। তারপর 'রাইফেল'। অবশ্য নিজের দল নিয়ে যাত্রাপালা রচনা ও অভিনয়ে উদ্যোগ এক মরশুমেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যাত্রাজগতের অভিজ্ঞতা তাঁকে পরবর্তী নাট্যরচনা ও নাট্য প্রযোজনায় প্রভাবিত করতে থাকে। 'শোনরে মালিক' থেকে শুরু করে 'রাইফেল', 'জালিয়ানওয়ালাবাগ', 'দিল্লী চলো', 'সন্ন্যাসীর তরবারি', 'মাও-সে-তুঙ', 'অরণ্যের ঘুম ভাঙছে', 'জয়বাংলা', 'সমুদ্রশাসন', 'ঝড়', 'সাদাপোষাক' প্রভৃতি যাত্রাপালা লিখেছিলেন তিনি। তাঁরই প্রচেষ্টায় বাংলা যাত্রাপালায় প্রত্যক্ষ রাজনীতি এবং রাজনীতি সচেতন যাত্রাপালা রচিত অভিনীত হয়েছিল।

টিপ্পনী

□ নাটকের কাহিনি-বিন্যাস

সাতটি দৃশ্য-সমন্বিত নাটক 'টিনের তলোয়ার'।

প্রথম দৃশ্য শুরু হয় কোলকাতার রাস্তায় মধ্যরাতে বেণীমাধব চাটুয্যে ওরফে কাপ্তেনবাবু তার সঙ্গী নটবরকে নিয়ে রাস্তার দেওয়ালে থিয়েটারের পোস্টার সাঁটাচ্ছে। বিরাট পোস্টারে ঘোষণা করা হচ্ছে 'দি গ্রেট বেংগল অপেরা (শোভাবাজার)'-এর গ্রাণ্ড প্রদর্শন আসছে - রোহীন্দ্র চৌধুরীর নাটক 'ময়ূরবাহন'। পোস্টারে টিকিটের দাম এবং স্বত্বাধিকারী বীরকৃষ্ণ দাঁ-এর নাম রয়েছে।

মাঝরাতে টিমটিমে গ্যাসের আলোতে মদের নেশার ঘোরে বেসামাল বেণীমাধব সঙ্গী নটবরকে নিয়ে এগিয়ে চলে। বেণীমাধব নটবরকে আরও দু-চারটে পোস্টার সেঁটে বাড়ি চলে যেতে বলে। বেণীমাধব যখন বিভোর হয়ে নিজেদের আসন্ন নাটকের পোস্টার দেখছে, তখন রাস্তার ম্যানহোল থেকে মাথা বার করে এম মেথর বালতিভর্তি ময়লা তুলে ফেলতে গিয়ে বেণীর প্রায় পায়ে ঢেলে দেয়। তারপর মাপ চেয়ে নিয়ে বলে, 'কলকাতার গরীবদের বিষ্টা বাবুর গায়ে দিলাম।' এবারে টিমটিমে গ্যাসের আলোতে বেসামাল বেণীমাধবের সঙ্গে নীচের তলার বাসিন্দা মেথর মথুরের সংলাপ শুরু হয়।

নাটকের মূল দ্বন্দ্বের ভাবনার সূত্রপাত এখান থেকেই আরম্ভ হয়। বেণীমাধবের মতো থিয়েটারের লোকেরা তথাকথিত বাবুসমাজের জন্য যে সব নাটক অভিনয় করে চলেছেন, তার সঙ্গে সমগ্র দেশের আপামর জনসাধারণের কোনো যোগ নেই। কোলকাতার নীচের তলায় থাকা এই মেথর, বাবুদের থিয়েটার দেখে না, সে মাইকেল মধুসূদনকেও চেনে না। বেণীর কণ্ঠে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর উদাও আবৃত্তি শুনে তার মন্তব্য ঃ 'জঘন্য'।

টিপ্পনী

যে ইন্ডিয়ান মিরার পত্রিকা বেণীমাধবকে, কাপ্তেন বেণীমাধব চাটুয্যকে 'বাংলার গ্যারিক' বলেছে, তার নামও মেথর শোনেনি। বেণীর দম্ভোক্তি ঃ 'কই গ্রেট নেশনেল থিয়েটারের অর্ধেন্দু মুস্তাফিকে তো বলেনি। যাক, আমি ঐ বেংগল অপেরা দলের মাস্টার।' বাবুদের সম্পর্কে বেণীমাধবেরও তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। আগে যখন সে যাত্রাদলে অভিনয় করত, তখন শ্যামবাজারের চক্কোত্তিবাবুদের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর পালা চলাকালীন মালিনী আর বিদ্যা 'মদন আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ' গান করে মুঠো মুঠো পালা পাচ্ছে। সখীর নাচ চলছে, বাবুরা সব রুপোর গেলাসে মদ্যপান করে চলেছেন, বাড়ির শালগ্রাম ঠাকুর পর্যন্ত নেশায় চুরেচুরে। ক্রমে মিলনের যন্ত্রণা, গর্ভ, রানির তিরস্কার, চোরধরা ও মালিনীর যন্ত্রণার পালা এসে পড়ল। মালিনীর কান্নায় যখন আসর সরগরম, তখন বাবুরা নেশার চমক ভেঙে দেখলেন, কোটাল মালিনীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। রেগে গিয়ে বাবু চিৎকার করে উঠলেন ঃ 'কোন্ ব্যাটার সাধ্যি আমার কাছ থেকে মালিনীকে নিয়ে যায়'। রুপোর গেলাসটি কোটালের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। 'বাপ' বলে কোটাল বসে পড়ল। আসর ভেঙে গেল। বেণীমাধব সেজেছিল কোটাল। এখনও কপালে সেই দাগ রয়ে গেছে।

বাবুদের প্রতি রাগত বেণীমাধব এবার নিজের পরিচয় দেয় – "আমি বামুন নই, দেখলেন? আমার জাত হচ্ছে থিয়েটারওয়ালা, অভিনয় বেচে খাই। আমার নিমচাঁদ তো দেখেননি। গিরিশ ঘোষের সাধ্য আছে অমন নিমচাঁদ করে?"

অভিনেত্রী মানদাসুন্দরীকে বেণী নিজের হাতে তিলতিল করে গড়ে তুলেছিলেন। বারাঙ্গনা জীবন থেকে তুলে এনে সেই তিলোত্তমাকে 'নীলদর্পণে'র ক্ষেত্রমণি সাজিয়েছিলেন। আর তাকেই ভাঙিয়ে নিয়ে চলে গেছে গ্রেট নেশনেলের বর্ণচোরা আমেরা। ফলে নতুন নাটক 'ময়ূরবাহনে'র নায়িকা অনুরাধার পার্ট করবে কে? তা নিয়ে কাপ্তেন বেণীমাধব চিন্তায় রয়েছে। তার উপরে তার চিন্তা নাট্যদলের মালিক বীরকৃষ্ণ দাঁকে নিয়ে। মালিকের পরিচয় দিতে গিয়ে বেণী জানিয়েছেঃ

"ব্যাটার ক-অক্ষর বোতল চলে, সে শালা হলো স্বত্ত্বাধিকারী। আর আমি বাংলার গ্যারিক, ঐ বেনে মুৎসুদ্দির সামনে আমাকে গলবস্ত্র থাকতে হয়।"

মেথর বেণীকে জিজ্ঞাসা করে-'এই সে ময়ূর লাটক না কি বলছেন-এটা কি নিয়ে লেখা?' উত্তরে বেণী জানায়, ময়ূরবাহন কাশ্মীরের যুবরাজ। বেণী গল্পটা বলতে গেলে তাকে বাধা দিয়ে মেথর বলে ওঠে –

"ধেত্তেরি যুবরাজ। মুখে রং মেখে চক্রবেড় ধুতি পরে, লাল-নীল জোড়া আর ছত্রি পরে রাজা উজীর সাজো কেন? এত নেকাপড়া করে টিনের তলোয়ার বেঁধে ছেলেমানুষী করো কেন?"

মেথরের এক-এক বাক্য বেণীর বুকে 'খরসান তরবারিসম' গিয়ে আঘাত করেছে।

তারপরেই শুরু হয় নাটকের আসল দ্বন্দ্ব-সংঘাত। ভোররাতে রাস্তায় বেণী আবিষ্কার করে ময়নাকে। নেপথ্যে নারীকণ্ঠে গান ভেসে আসে-

"ছেড়ে কলকাতা বোন – হবো পগার পার।
পুঁজিপাটা চুলোয় গেল, পেট চালানো হলো ভার।"

গান গাইতে গাইতে ময়না চলে স্টেজের ওপর দিয়ে। ময়নার গান শুনে আকৃষ্ট হয়

বেণীমাধব। মেথর পরিচয় দেয় – 'ময়না। বদ্দিবাটির আলু, হাসনানের বেগুন, এসব বেচে পেট চালায়।' অবলীলায় 'ডি-শার্পে' গান গাইতে গাইতে ময়না এগিয়ে চলে। ময়নার পেছন পেছন বেণীর প্রস্থান।

প্রথম দৃশ্যের এখানেই শেষ। প্রথম দৃশ্যের নাটকের মুখবন্ধ তৈরি করে নেন নাট্যকার। এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে একশো বছর আগেকার বাংলা থিয়েটারের তিনটি সমস্যা ফুটে ওঠে। প্রথমত, মুৎসুদ্দিবাবু তথা মালিকদের নিয়ে সমস্যা। দ্বিতীয়ত, বামুনদের নিয়ে সমস্যা। তৃতীয়ত, বাবুদের করা, বাবুদের নাটকে থাকে না নীচুতলার সাধারণ মানুষের কথা। বাংলা থিয়েটারে চলেছে রঙচঙে মেখে রাজা উজির সেজে টিনের তলোয়ার নিয়ে ছেলেমানুষি। বোঝা যায়, উনিশ শতকের নাটকের লড়াই কোথা থেকে শুরু হচ্ছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে শুরু হয় চিৎপুরে বেংগল অপেরার রিহার্সাল ঘরে। ঘরটি দৈনন্দিন ও শাশ্বতের সংমিশ্রণে বিচিত্র হয়ে আছে। দৈনন্দিনের গামছা, ধুতি শাড়ির পাশাপাশি ঝলমলে রাজবেশ। নড়বড়ে তক্তপোশের পাশে বড়ো রাজসিংহাসন। ছাতা, বাঁকা তলোয়ার, হাঁড়ি-পাতিল-ভাঁড়, মুকুট উষ্ণীষ সব ছাড়ানো। দেয়ালজোড়া নানা পোস্টার জানান দিচ্ছে এই নাট্যদলের অভিনীত নাটকের তালিকা – ভানুমতি চিত্ত বিলাস, রামাভিষেক, শর্মিষ্ঠা, ময়ূরবাহন। এহেন নরককুণ্ডের মাঝে দাঁড়িয়ে কেউ পার্ট মুখস্থ করছে, কেউ নিজের পার্ট পড়ে নিচ্ছে, কেউ তার বাদ্যযন্ত্র ঠিক করে নিচ্ছে, কেউ মনোযোগ সহকারে পড়ে চলেছে 'ভারতসংস্কারক' পত্রিকা। তবলা, হারমোনিয়ামের অন্যধারে বগলে একতাড়া কাগজ নিয়ে বসে আছে প্রিয়নাথ। প্রম্পটার নটবরের সাহায্যে জলদ পার্ট রপ্ত করছে। এখানেই একে একে উন্মোচিত হচ্ছে তাদানীন্তন থিয়েটারের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিবন্ধকতার বয়ান।

প্রথমত, তখনকার বেশিরভাগ সংবাদপত্রগুলি থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল। বিশেষ করে, তখন অভিনেত্রীদের গ্রহণ করা হতো বারাঙ্গনা পল্লী থেকে। ভদ্রঘরের সামাজিক মেয়েদের তখন মঞ্চে অংশগ্রহণ করা সামাজিক কারণেই সম্ভবপর ছিল না। বারাঙ্গনা পল্লীর এই সব মেয়েদের নিয়ে থিয়েটারে বেলেল্লাপনা চলছে – এরকম বিষয়কে সংবাদপত্রগুলি তীব্রভাবে নিন্দা করতে থাকে। এর মধ্য দিয়ে থিয়েটারকেই সমাজে অপাংক্তেয় করে রাখার চেষ্টা চলে। গোবর ও জলদ এ সংলাপের মধ্য দিয়ে সেই চিত্রই ফুটে উঠতে দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত, রিহার্সাল চলছে। ঠোঙায় করে মুড়ি খাওয়া হচ্ছে। অভাব-অভিযোগের কথা ওঠে। এ-তো শুধু গ্রেট বেংগল অপেরার চিত্র নয়। এ-তো উনিশ শতকের সেই সময়কার সমস্ত থিয়েটারের চিত্র। মানুষের জীবনযাত্রা, তার দৈনন্দিন উপচার, তার অভাব-অভিযোগ, তার হাহাকার-সে তো দেশের মানুষেরই কথা। দলের এতগুলি লোকের খাওয়ার জন্য মোটে আট আনা দিয়ে বাজারে পাঠানো হয়। দৈন্যের হাহাকারকে চাপা দেবার জন্য বাস্তবতাকে অস্বীকার করে অধিবাস্তবতার আমদানি। একদিকে নটবর ও বসুন্ধরার সংলাপের মধ্য দিয়ে কঠিন বাস্তব রূপ প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে রাঙতার মুকুট, টিনের বাঁকা তলোয়ার নিয়ে বাস্তবতাকে অস্বীকার করার দুরন্ত প্রয়াস। প্রিয়নাথের সংলাপই ধরিয়ে দেয় এই বৈপরীত্য – 'রোম পুড়িতেছে, সম্রাট ব্যায়লা বাজাইতেছেন।' কিংবা 'এদিকে হাহাকার, ওদিকে বুলবুলির লড়াই।' দেশজুড়েই সহাবস্থান। একেই নাট্যকার বলেছেন 'নরককুণ্ড'। আর এই নরকুণ্ডের মধ্যে বসেই দলের লোকেরা যে যার কাজ করে যাচ্ছে। মুদি ও জলদের সংলাপ, থিয়েটারের অভিনেত্রী সম্পর্কে

টিপ্পনী

দলের মনোভাব ও মুদির মনোভাবের পার্থক্য অন্য এক বাস্তবতার জন্ম দেয়। কাপ্তেন বেণীমাধবের পালা দেখার জন্য যেখানে ছোটলাটের আকুলি - মুদি সে পালা দেখে না। তার মতে 'না-না, ওসব লোচ্চামি আমি দেখি না।' ধারের বদলে গুষ্ঠিশুদ্ধ গেলার খেসারত হিসেবে দামি সেজবাতিটা নিয়ে মুদি চলে যায়। তার চলে যাওয়ার পর জলদ বলে, 'এই তো দেশের অবস্থা! দেশের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী একটা নিরক্ষর মুদির কাছে হাতজোর করছে।'

টিপ্পনী

তৃতীয়ত, প্রিয়নাথ বলেছিল, 'হাতজোড় না করলেই হয়।' প্রিয়নাথ এখানে ছয়দিন ধরে আসছে। সে 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটক লিখে দিয়েছে। তার কী হলো - তা জানবার জন্যই তার এখানে আসা। রিহার্সালের ফাঁকে ফাঁকে দলের কথোপকথন থেকে জানা যায়, মূল অভিনেত্রী মানদাসুন্দরীকে 'গ্রেট নেশনেলে'র ঘাঘিখোচররা ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। তার অভাবে নতুন নাটক 'ময়ূরবাহন'-এর নায়িকা অনুরাধা কে সাজবে তাই নিয়ে সকলের চিন্তা। হরবল্লভ ও জলদের কথা থেকেই তা জানা যায়। এরকম পরিস্থিতিতে ময়নার প্রবেশ। বেণীমাধব প্রথমে ময়নাকে দূর করে দিতে চাইলেও পরে নেশা ও ঘুমের ঘোর ভাঙলে বিগত রাতে ময়নার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাকে আসতে বলার কথা মনে পড়ে। ময়না গ্রেট বেংগলে যোগ দেয়। কিন্তু ময়নার জাত ও যোগ্যতা নিয়ে জলদ ও হরবল্লভ প্রশ্ন তোলে। বেণীমাধব শিখিয়ে তৈরি করে নায়িকার অভাব পূরণ করবে ময়নাকে দিয়ে।

একদিকে যখন থিয়েটারের ভিতরের সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা চলছে, তখন-ই বাইরের অন্য এক সমস্যা সামনে আসে। বাইরে থেকে ইট এসে জানলার কাচ ভেঙে কাপ্তেনবাবুর পিঠে পড়ে। তখনকার থিয়েটারের বিরুদ্ধে এ আর-এক আক্রমণ। পাড়া প্রতিবেশীর আক্রমণ। সমাজে-পাড়ায় থিয়েটার করা যে অন্যায় - সেরকম একটা দৃশ্য এঁকে নাট্যকার তখনকার থিয়েটারওয়ালাদের প্রতিবন্ধকতার স্তরগুলি দেখাতে থাকেন। প্রতি আক্রমণ না করে থিয়েটারের নকল ঢাল দিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়। এদিকে প্রিয়নাথ 'পলাশীর যুদ্ধ' নামে যে নাটক লিখেছিল, সেই নাটকের পৃষ্ঠাগুলি ঠোঙা করে মুড়ি খাওয়া হয়েছে শুনে প্রিয়নাথ আর্ত চিৎকার করে ওঠে। বেণী তাকে বাবু বললে, বসুন্ধরা বলে, 'এ ছেলে বাবু নয়'। প্রিয়নাথ ধনীবাবুর সন্তান হলেও, সেরকম পোশাক ছাড়তে না পারলেও এখন সে বাবুসমাজের বাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সব ছেড়ে চলে এসেছে। শ্রেণিচ্যুত প্রিয়নাথ নাট্যদলে শামিল হয়ে যায়।

চতুর্থত, থিয়েটারের ওপর আর এক আক্রমণ নেমে আসে। সমাজপতি নদের চাঁদ বাচস্পতি তার লোকজন নিয়ে, গুণ্ডা সঙ্গে নিয়ে একে বারে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। বাচস্পতির এরকম আক্রমণ প্রায়শই হয়। সমাজনেতাদের এই আক্রমণ সেদিন বাংলা থিয়েটারে ঘটে চলেছিল। এই সমাজনেতা বাচস্পতিরা শুধুমাত্র ব্রিটিশের ভয়ে ভীত। তাদের দাসানুদাস।

পঞ্চমত, থিয়েটারি কাজকর্ম ও কথাবার্তার ফাঁকে আর এক প্রতিরোধ প্রবেশ করে। গ্রেটবেংগলের মালিক বীরকৃষ্ণ দাঁ। মালিকানা-ভিত্তিক বাণিজ্যিক থিয়েটার চালাতে গেলে বীরকৃষ্ণের মতো পয়সাওয়ালা ব্যবসায়ী লোকের প্রয়োজন। অথচ এরাই অন্য পাঁচটা ব্যবসায়ের মতো থিয়েটারকেও লাভ-লোকসানের একটা ব্যবসা বলে বুঝেছে - লাভের আশায় থিয়েটারে অর্থ বিনিয়োগ করেছে। বাংলা থিয়েটার গড়ে তুলে অব্যাহত রাখার জন্য এদের অর্থ সাহায্য দরকার। আবার নাটক ও নাট্যশালার অগ্রগতিতে এদের সরিয়ে দেওয়াও দরকার। বাংলা থিয়েটারকে বহুদিন এই দোটানায় ভুগতে হয়েছে। বেণীমাধব এ বিষয়ে আক্ষেপ করে বলেছে ঃ

"বীরকৃষ্ণ দাঁ... সে শালা হলো স্বত্বাধিকারী। আর আমি বাংলার গ্যারিক, ঐ বেনে মুৎসুদ্দির সামনে আমাকে গলবস্ত্র থাকতে হয়।"

এই নাটকে এসব মালিকের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। বেণী ও বীরকৃষ্ণের কথপোকথন চলতে চলতে ময়নার প্রবেশ ঘটে। তাকে দেখে বীরকৃষ্ণের অভিভূত উক্তি ঃ

"কাপ্তেনবাবু, মাইরি বলছি এমন রূপ চক্ষেতে বহুকাল পড়েনি গো।" তারপরেই মালিক বীরকৃষ্ণের দরাজ হয়ে যাওয়া ঃ "সব হবে, সব হবে। ভদ্রঘরের মেয়েছেলে দেখাবো এস্টেজে। গ্রেট নেশনেল তলিয়ে যাবে, হ্যাঁ।...কোনো ভয় নেই, আমি আছি।"

টিপ্পনী

ষষ্ঠত, পথের ময়না এবার স্টেজের 'শংকরী'-তে রূপান্তরিত হচ্ছে। জলদ, যদু-এরা ময়নার পরিবর্তন দেখে হতবাক হয়ে যায়। তার উচ্চারণ, কথাবার্তার ঢঙ সব পরিবর্তন করার নিরন্তর প্রচেষ্ঠা চলতে থাকে। শিক্ষক বেণীমাধব পাথরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে চলেছেন। তালতাল মাটি দিয়ে প্রতিমা গড়ে চলেছেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা।

তৃতীয় দৃশ্য শুরু হচ্ছে দি গ্রেট বেংগল অপেরার শোভাবাজারস্থ রঙ্গমঞ্চে। নাট্যাভিনয় শুরু প্রাক্-মুহূর্ত। মঞ্চ ও নেপথ্যভূমি একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। বাজনা বাজছে, প্রিয়নাথ স্টেজ ঝাঁট দিচ্ছে, বেণীমাধব আলোর জোগাড়যন্ত্র করে চলেছেন। নটবর মঞ্চের নানা কর্মীকে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে। সামনে হলভর্তি দর্শক, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যে যার ভূমিকা অনুযায়ী প্রস্তুত হচ্ছেন। পার্ট ঝালিয়ে নিচ্ছেন শেষবারের মতো। সবাই স্টেজকে নমস্কার করে নিচ্ছে। ময়নার আজ প্রথম মঞ্চাবতরণ। তাই বেশ নার্ভাস। সবাই সাহস জোগায়। মালিক বীরকৃষ্ণ ও তার লোকজন মদের বোতল নিয়ে ঢুকলে বেণী আপত্তি জানায়। এদিকে ময়না ওরফে শঙ্করীর প্রতি লোভ তখন থেকেই বীরকৃষ্ণের মধ্যে দেখা দিয়েছে। 'ময়ূরবাহনে'র মতো ওঁচা নাটক তৈরি করার জন্য বেণী আক্ষেপ করে। ঘন্টা পড়ে। পর্দা ওঠে। 'ময়ূরবাহন' নাট্যাভিনয় শুরু হয়। নায়িকা অনুরাধা-বেশী ময়না গানে অভিনয়ে মাতিয়ে দেয়। প্রাথমিক সঙ্কোচ, বিহ্বলতা, আড়ষ্টতা, ভীতি, দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে থাকে ময়না। প্রেক্ষাগৃহ থেকে মত্ত চিৎকার ভেসে আসে - 'বেড়ে বিবিজান, বেড়ে বলেছ বাবা'-হাততালি। মঞ্চ ছেড়ে নেপথ্যে এসে ময়না বসুন্ধরার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। - 'ওখানে মাতাল, মাতালের দল হল্লা করছে।' বসুন্ধরা ঃ "শুধু সামনে চারসারি মাতালবাবুর দল। পেছনে মানুষ, দর্শক, আমাদের দেবতা। তারা হাততালি দিয়েছে। তোকে চাইছে, আশীর্বাদ করছে। তুই নিবি না সে আশীর্বাদ।"

ময়না ও জলদ অর্থাৎ অনুরাধা ও ময়ূরবাহনের অভিনয় চলতে থাকে স্টেজে। প্রেমের উচ্ছ্বাসে অনুরাধা যখন বলে, 'বল, বল কতদিনে হইবে মিলন?'

তৎক্ষণাৎ দর্শক থেকে উচ্চারিত হয় 'এখুনি, এখুনি বিবিজান।' দর্শক বাবুরা চিৎকার ফেটে পেড়েন।

ময়নার অভিনয়ে দলের সবাই খুশি হয়। সবাই সাধুবাদ জানায়। ময়না বেণীকে প্রণাম জানায়। বেণীমাধব এবং বসুন্ধরা মঞ্চে এসে ঢুকে নাটকের বিক্রম ও সাবিত্রীর ভূমিকায় অভিনয় শুরু করে দেয়। দর্শক স্তব্ধ হয়। আবার মাঝে কোলাহল বাড়ছে দেখে সিংহাসন ছেড়ে এগিয়ে এসে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে ঃ

"মেয়েছেলে চান তো কাছেই বিশেষ পাড়া আছে, সেথায় স্বচ্ছন্দে গমন করতে পারেন।

এঠা নাট্যমন্দির। জলসাঘর নয়। এখানে পূজারীর ভাব নিয়ে বসতে হয়। না পারলে বেরিয়ে যান। (নিস্তব্ধতা নেমে আসে), বক্সগুলো থেকেই চীৎকারটা হচ্ছে-চুপ করে থাকুন।"

তারপর আবার নাটকাভিনয় চলে। বিক্রম সাবিত্রীর চক্রান্ত, ময়ূরবাহনের পলায়ন, বিদ্রোহী সেনা নিয়ে কাশ্মীর আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনায় বেণীমাধব ও বসুন্ধরার অভিনয়ে নাটকের আকর্ষণ যখন তুঙ্গে, তখন হঠাৎ মঞ্চের উপর আবির্ভূত হন বীরকৃষ্ণ দাঁ, শঙ্করীকে হাত ধরে তিনি টেনে আনেন মঞ্চে। প্রেক্ষাগৃহে করতালি। ময়না (শঙ্করী) জোড়হাতে বাবুদের আশীর্বাদ গ্রহণ করছে। নাটক ও নাট্যাভিনয়ের উপর মালিকের প্রতাপ, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, নাটককে অস্বীকার করে নায়িকার উপস্থিতি - হতভম্ব করে দেয় বেণীমাধবকে। বিক্রমের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে বেণী বলে ওঠে, 'একি? একি? আমার শিন তো শেষ হয়নি এখনো!'

টিপ্পনী

চতুর্থ দৃশ্য। খ্যাতির শীর্ষে আলোয় উদ্ভাসিত অভিনেত্রী ময়না বৌবাজারের রাজপথে এবং সামনে 'অনিবার্য দুর্ভাগ্যের মতন' সেই ম্যানহোল সাফ করা মেথর। ময়না ঘুরে ঘুরে 'সঙ' দেখে বেড়ায়। মেথর বলে, 'তুমি তো মুচির কুকুরের মতন ফুলে উঠেছ দেখছি।' ময়না এখন বাবুদের সঙ্গে ওঠাবসা করে, জুড়িগাড়ি করে তাদের সঙ্গে ঘোরে, বজরা করে বাবুর সঙ্গে চন্দননগর যায়। মেথরের সটান প্রশ্ন 'বাবুরা গায়েটায়ে হাত দিল?' ময়না আপত্তি জানিয়ে বলে ঃ

"ইঃ কাছে ঘেঁষে এলে মারি এক চড়। আমি একট্রেশ, বেশ্যা নই।" বৌবাজারে ময়না এসেছে বুলবুলির লড়াই দেখতে। বৌবাজারের জীবনছন্দটা ময়নার খুব ভালো লাগে। বৌবাজারের আলোকিত জীবনের পাশে দু-তিনজন ক্ষুধার্ত অর্ধউলঙ্গ, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ রাস্তার উপর পর্ণকুটির বেঁধেছে। তারা এগিয়ে এসে ভিক্ষে চাইলে, ময়না দ্রুত সরে যায়। প্রিয়নাথ ঢোকে। ইউরোপীয় পোশাক, হাতে ছড়ি। ময়নাকে নিয়ে সরবতের দোকানে বসে। ভিক্ষুকেরা সেখানে এসেও ভিক্ষে চাইলে প্রিয়নাথ পয়সা বের করে দেয়। ময়না আপত্তি জানায়। ভিখারিদের তাড়িয়ে দিতে বলে। নতুন জীবনে এসে ময়না তার ফেলে আসা পুরনো ক্লেদাক্ত জীবনকে ভুলে থাকতে চায়। এখন সেই জীবনকে সে ঘেন্না করে। বাবুরা তাকে গয়না দিয়ে সাজিয়ে দেয়।

এমন সময় বাইরে গোলমাল শুরু হয়। কারণ, ইন্দ্রসাহার চালের আড়ত থেকে চাল নিয়ে যাচ্ছিল জাহাজঘাটায়। ভিখিরির দল সে চালের রাস্তায় খাবলা মারতে গেছে। ল্যাম্বোসাহেব এসে বেধড়ক 'বগি-হুইপ' চালাচ্ছে। প্রিয়নাথ এসব দেখে ক্রোধে কাঁপতে থাকে। দেশের এই পরিস্থিতিতে সজ্জিতা, সালংকারা ময়নাকে দেখলে মনে হয় - 'পেতিনির শ্রাদ্ধে আলেয়ার মতন শঙ্করী'। এমন সময় বাচস্পতি প্রবেশ করে। সে পূর্বের দৃশ্যের অনুযোগ আবার এখানে করে - "এই রমনী ভদ্রলোকের কন্যা হইয়া কুলমান ভুলেছে। কলকাতার হিন্দুসমাজের জাত মাল্লে, ধর্মনাশ কল্লে। একটো করছে। এস্টেজে মদ খেয়ে পুরুষের সঙ্গে নাচছে।" প্রিয়নাথকেও থিয়েটারের লোক বলে গালমন্দ করে। এমন সময় এক যুবক এসে গান ধরে। গানে গানে সে সেযুগের মেয়েদের স্টেজে অভিনেত্রী হয়ে যোগ দেওয়াকে ব্যঙ্গ করে। সকলের টিটকিরি ও হাস্যধ্বনির মধ্যে প্রিয়নাথ ও ময়নার মন্থর প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য। গ্রেট বেংগল থিয়েটারে বেণীমাধবের সাজঘর। এক কোণে একটি আরামকেদারায় আধা অন্ধকারে বসে আছে বীরকৃষ্ণ। বাইরে মঞ্চে বেণীমাধবের কণ্ঠে 'সাধবার একাদশী' নাটকের শেষ সংলাপ ধ্বনিত হচ্ছে ঃ

"কি বোল বলিলে বাবা বলো আরবার,
মৃতদেহে হোল মম জীবন সঞ্চার।
মাতালের মান তুমি গণিকার গতি,
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি।"

নাটক শেষ হয়, হাততালি ও হাসির ঝড়ের মধ্যে। নিমচাঁদ-বেণীমাধব এবং প্রিয়নাথ সাজঘরে ঢোকে। ইংরেজি না জেনেও বেণী এত ভালো করে নিমচাঁদের ইংরেজি সংলাপ বলে যায় কী করে? প্রিয়নাথের জিজ্ঞাসার উত্তরে বেণী জানায়, সে জানবাজারে কোয়েল হো নামে এক ফিরিংগির কাছে ইংরেজি উচ্চারণ শিখেছে। অর্থ না বুঝেও স্রেফ কানে শুনে রপ্ত করে নিয়েছে সংলাপ। প্রিয় জানায়, গ্রেট নেশনাল থিয়েটার 'গজদানন্দ' ধরেছে। গ্রেট বেংগল বা বেণী এ খবর রাখে না। বেণী ঃ "সেটা আবার কি? (হঠাৎ কি মনে হতে) গজ। এবার এস্টেজ হাতি তুলবে নাকি?"

টিপ্পনী

প্রিয়নাথ ঃ "পুরো কলকাতা যা নিয়ে আলোচনা করছে, এই বেংগল অপেরার দুর্গের মধ্যে সেটা এসে পৌঁছয় নি এখনো।"

ব্রিটিশ যুবরাজের কোলকাতা আগমন উপলক্ষ্যে হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে অন্দরমহলে মহিলাদের দিয়ে বরণ করেছে। এই নিয়ে কোলকাতা তোলপাড়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে প্রিয়নাথ বলেছেঃ

"ব্রিটিশের পা-চাটা গোলাম, বউদের বাড়ি থেকে বেরুতে দেয় না। কেননা, বাবু হিন্দু। কিন্তু সাহেব প্রভুকে অন্দরে নিয়ে বউ দেখিয়ে মোসায়েবি করতে হিন্দুয়ানিতে বাধে নি। সেই জগদানন্দকে ব্যঙ্গ করে গ্রেট নেশনেল নাটক করছে। 'গজদানন্দ'। গান লিখেছেন গিরিশ নিজে।"

বেণী এই ঘটনাকে তেমন পাত্তা দেয় না। বেণী হিসেব-পত্তর দেখে বলে যে, গ্রেট বেংগল তিনমাস একটানা হাউসফুল। গ্রেট নেশনেল বাপের জন্মে দেখেছে এমন! নাটক লেখা নিয়ে বেণী প্রিয়নাথকে তাচ্ছিল্য করলে প্রিয়নাথ তার লেখা 'তিতুমীর' নাটকের পাণ্ডুলিপি বেণীমাধবের কাছে ছুঁড়ে দেয়। -'পড়ে দেখুন। রীড বিফোর ইউ সিট ইন জাজমেন্ট, স্যার।'

প্রিয়নাথ যখন জানতে পারে যে, এদের পরবর্তী নাটক 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', তখন জানায় ঃ 'তার চেয়ে ঐ শুয়ারের বাচ্চা বীরকৃষ্ণ দাঁর ভাড়াকরা মোসাহেব হয়ে যান।'

এবার বীরকৃষ্ণ দাঁ অন্ধকার কোণ থেকে গলা খাঁ-কারি দিয়ে ঢোকে। নিজের নামে গালাগালি শুনেই সে এগিয়ে আসে। বীরকৃষ্ণ ঠিক করেছে, সে থিয়েটার তুলে দেবে। কারণ হিসেবে সে জানায় ঃ

"আমার বিরাট বালতিপোঁতা সংসার, পাটের দালালি, চায়ের এজেন্সি, সুদ, বন্ধকী, রাঁড়, থিয়েটার। সাড়ে তিনলাখ টাকা লস খেয়ে আমি ঠিক করেছি থিয়েটারের ব্যবসা ছেড়ে দেব।"

বেণী এই খবরে বিষম খায়। সে ব্যবসা রম রমিয়ে চলছে - তা বোঝাতে গিয়ে বলে, 'গত তিনমাসে আটত্রিশ হাজার টাকা তুলে দিয়েছি আপনাকে।' কিন্তু এটুকু লাভকে বীরকৃষ্ণ লোকসান বলেই মনে করেন। তবে বীরকৃষ্ণ ঠিক করেছেন, শ্যামবাজারে তার যে গরবিলি জমিটুকু আছে, সেটা বেংগল অপেরাকে দিয়ে দেবেনে। সেখানে গ্রেট বেংগলের নিজের থিয়েটার তৈরি করার

জন্য আট হাজার টাকা দেবেন। তারপরে তিনি আর এই থিয়েটারের ঝামেলাতে থাকবেন না। স্বত্বাধিকারী হবেন বেণীমাধব নিজে। বেণী প্রাথমিকভাবে উৎফুল্ল হলেও পরক্ষণেই শঙ্কিতভাবে বীরকেষ্টর কাছে জানতে চায়, 'প্রতিদানে কি চান বলুন দিকি। বিনামূল্যে দাক্ষিণ্য তো এমন বজ্জাতে সম্ভবে না-ইয়ে-কি চান?' বীরকৃষ্ণ ঃ "ঐ শংকরী পাখা মেলে উড়ছে যার তার সংগে। ওকে আমি ....ইয়ে....রাখবো, সে ব্যবস্থাটা করে দিতে হবে।"

টিপ্পনী

বেণী বীরকৃষ্ণের প্রস্তাবে সম্মত হয়। কিন্তু বসুন্ধরা, প্রিয়নাথ, ময়নারা তীব্র আপত্তি জানায়। নিজের থিয়েটার হওয়ার লোভে বেণী অনড়। সে ময়নার কথা ভাবে না। প্রিয়নাথ বেণীর মোরালিটির কথা তোলে। বেণী উত্তরে জানায়, 'নীতিবোধ নিয়ে চললে আর থিয়েটার করতে হোতো না এদেশে।' ময়নাকে না পেলে বীরকৃষ্ণ দল তুলে দেবে। তখন কী হবে? বসুন্ধরা জানায়, তারা ভিক্ষে করে খাবে, তবু কাপ্তেনবাবুর বাগান বাড়িতে নাচওয়ালি হয়ে থাকতে ময়নাকে বারণ করে সে, ময়নাকে চলে যেতে বলে। উত্তরে ময়না জানায় ঃ "কোথায় যাব? আর তো তরকারির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বাজারে গিয়ে বসতে পারবো না। এমন ভদ্রমহিলা বানিয়েছ যে খেটে খাওয়ার উপায় পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি।"

বসুন্ধরা নিজের অপূর্ণতা ময়নার মধ্য দিয়ে পূরণ হোক, তা দেখাতে চায়। ময়নার সংসার হোক, কোলে রাঙা ছেলে আসুক। তার উক্তি ঃ 'তোমার মধ্যে আমি পূর্ণ হই।'

কিন্তু ময়না পারে না, সে ডাকে সাড়া দিতে পারে না। প্রিয়নাথ অভিযোগ করে, 'গুলিয়ে ফেলছ। রং-কাঠ, চট-আলো-জরিকে ভাবছো আসল জগৎ।' উত্তরে ময়না জানায়, 'আমার কাছে সেটাই আসল। থিয়েটার ছাড়া বাঁচবো না।' প্রিয়নাথ তাকে এই মায়ার জগৎ ছেড়ে রক্তমাংসের মানুষের মাঝে নিয়ে যেতে চায়। ময়না তা-ও অস্বীকার করে।

আলো-আঁধারির মাঝে বীরকৃষ্ণ ধীর পায়ে এগিয়ে এসে মান্টিথের দোকান থেকে গড়িয়ে আনা সোনার ব্রেসলেট আর দুল ময়নাকে পরিয়ে দেয়। ধরা দেয় ময়না বীরকেষ্টর কাছে। ময়না মেঘনাদবধ থেকে আওড়ায় ঃ

"কোন্ ধর্মমতে, কহ দাসে শুনি, জাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি এ সকলি দিলা জলাঞ্জলি।"

ষষ্ঠদৃশ্য। স্টেজে 'তিতুমীর' নাটকের ড্রেস রিহার্সাল চলছে। বেণী তিতুমীর। জলদ বন্দি সাহেব মাগুয়ার। লাল পোশাক। দুজনে তাদের পার্ট বলছেন। অন্য সবাই শুনছে। 'বঙ্গলক্ষী' করবে ময়না। সে এখনও এসে পৌঁছয়নি। তাই অভ্যেস চলে তলোয়ার খেলার। হরবল্লভ বলে, প্রিয়নাথ মল্লিকের 'কলমের জোরেই এ-বই ধরে যাবে।' বেণীমাধব স্বীকার করে ঃ

"নাঃ হিন্দুকলেজের বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক নাটক লেখেন ভালই। আগে বুঝিনি। আঙুর, ওর আগেই নাটকটা দিয়ে মুড়ির ঠোঙা বানিয়ে তুমি বোধহয় বাংলা সাহিত্যের এক অবর্ণনীয় ক্ষতি করেছ।" ময়নার জন্য কোথায় একটা বেদনা বোধ করেন বেণী। বীরকৃষ্ণের কাছে ময়নার নাম এখন টুকটুকি। 'তিতুমীর'-এর রিহার্সাল আবার শুরু হয়। রাত বারোটা বেজে গেলেও রিহার্সাল চলে। এবার বঙ্গলক্ষী বেশী ময়নার গান শুরু হয়। বীরকৃষ্ণ বুঝতে পারেন, এগান 'তিতুমীর' নাটকের গান। আর এই নাটক দেশপ্রেমের নাটক। তাই বলেন ঃ 'তিতুমীর নাটক হচ্ছে না।' বসুন্ধরা মনে করিয়ে দেন, এখন এই থিয়েটারে বীরকৃষ্ণের কথা আর খাটবে না। কারণ তিনি আর এই থিয়েটারের মালিক নন। কিন্তু বীরকৃষ্ণ অনড়। বেণীমাধব বীরকৃষ্ণের ফতোয়া অস্বীকার

করলে, সে একটি ঘটনা শোনায় ঃ

"(হর্ষোৎফুল্ল) কিন্তু প্রিয়নাথের নাটকটা হতে পাচ্ছে না, কারণ আজ সন্ধ্যায় গ্রেট নেশনেলে এক কাণ্ড ঘটে গেছে-জানেন না? আজ উপেন দাস, অমৃতলাল, ভুবন নিয়োগী, মহেন্দ্রবাবু, মতিসুর সব গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন-"

ময়না এগিয়ে এসে বলে, 'আমি বীরকেষ্ট দাঁ-কে বলে দিয়েছি, কাপ্তেন বাবু ছাড়বে না। লম্বট সাহেবের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারবে তিতুমীর নাটক।'

টিপ্পনী

নিরুত্তর বেণী সব অভিনেতার মন বোঝার চেষ্টা করে ঘুরে ঘুরে। বিকৃতস্বরে হেসে উঠে বলে, অন্য থিয়েটারের প্রতিদ্বন্দ্বী সবাই যখন জেলে, তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বেংগলকে পায় কে? বেংগল এবার একাই রাজত্ব করবে কোলকাতায়। এই বলে বেণী 'তিতুমীর'-এর পাণ্ডুলিপি বন্ধ করে দেন। বীরকৃষ্ণ 'সাধবার একাদশী' অভিনয়ের কথা বলে। ময়না বলে, 'কাপ্তেনবাবুকে তিতুমীর করতেই হবে।' বেণী অনড় থেকে ঘোষণা করে 'সধবার একাদশী' হবে। 'তিতুমীর' হবে না। বেণীমাধবের ভিতরের দ্বন্দ্ব বোঝা যায়। একদিকে পরাধীন দেশের থিয়েটারকর্মীর প্রাথমিক দায়িত্ব, বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে জেহাদ এবং অন্যদিকে বাণিজ্যিক থিয়েটারের অস্তিত্বের লড়াই।

'সধবার একাদশী'র রিহার্সাল শুরু হয়। বেণী প্রিয়নাথের 'তিতুমীর' নাটকের পাতা ছিঁড়তে থাকে - 'শালা রক্তের মধ্যে ঢুকে যায় এমন সব চোখাচোখা কথা' - ছিঁড়তে ছিঁড়তে হঠাৎ একজায়গায় এসে পড়তে থাকেন। সবাই চলে যায়। বসুন্ধরা পাশে এসে বসে। বেণী চিৎকার করে পড়েন ঃ 'ফিরিঙ্গি দস্যুর রক্তে এই বাঁশের কেল্লার চারদিকের মাটি উর্বর করবো ফতেমা।' এ নাটক অভিনয় করলে দ্বীপান্তর। বসুন্ধরাকে বেণী বলে ঃ

"আমার একটা দায়িত্ব নেই? দলের লোকগুলোর রুজিরোজগারের দায়িত্বটা আমার নয়? আমি জেলে গিয়ে বসলে এদের কি হবে? থেটার উঠে গেলে দেশের খুব উপকার হবে? দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে? ইংরেজ পালাবে? কি যে সব বলে?"

বেণীর মধ্যে নিরন্তর লড়াই চলে। এসব প্রশ্ন যেন সে নিজেকেই করে চলেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগের প্রস্তুতি চলেছে তার নিজের মধ্যেই, বেণীর দেওয়া মদ বসুন্ধরা প্রত্যাখ্যান করে। বেণীর ভিতরের দ্বন্দ্ব প্রকটিত হতে থাকে। প্রিয়নাথের বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলা কথা শুনে বেণী বলে ওঠে ঃ

"যা যা বেশি দেশসেবা দেখাস নে। তোকে টুকরো টুকরো করে কাটলেও বোধ করি এই হুতাশনের নির্বাণ নেই। আমি আসলে বড় একা। কেউ-ই কখনো পাশে নেই। দেবতার মতন একা। অভিশাপের মতন, অবজ্ঞার মতন একা।"

বসুন্ধরা তখনও গুরু অর্ধেন্দুশেখরের শেখানো মাইকেলের সনেট 'পরিচয়' থেকে দেশবন্দনার গীত আবৃত্তি করে চলেছে। (বসুন্ধরার উদাও আবৃত্তির তালে তালে আবির্ভূত তিতুমীরের যোদ্ধার দল ও ব্রিটিশ সেনা। তাদের মূক নীরব যুদ্ধ চলে এবং ব্রিটিশের জয়)-বসুন্ধরা তখনও আবৃত্তি করে চলে ঃ "সে দেশে জনম মম, জননী ভারতী"। (সামনে নিহত কৃষকদের মৃতদেহ। বসুন্ধরা প্রণাম করছেন দেশের উদ্দেশে।)

টিপ্পনী

সপ্তম দৃশ্য। বেংগল অপেরার রঙ্গমঞ্চ। মঞ্চ এবং সামনের দর্শক আসনের বক্স দুটি একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। একটি বক্সে বীরকৃষ্ণ দাঁ, ময়না এবং পরিচারকেরা। অন্যটিতে ব্রিটিশ শাসকের প্রতিনিধি ল্যাম্বার্ট ও অন্যান্য ইংরেজ রাজপুরুষ। মঞ্চে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটকের অভিনয় চলছে। যে যার ভূমিকায় অভিনয় করছে। নিমচাঁদ বেণীমাধব। অটলবেশী জলদ। অত্যাধিক মদ্যপানে বেণীমাধব টলছেন। সংলাপের মধ্য দিয়ে 'সধবার একাদশী' এগিয়ে চলে। বেণীর ইংরেজি সংলাপ শুনে বক্স থেকে বীরকেষ্ট উচ্চস্বরে 'ব্রেভো বলে ওঠেন। বেণী অগ্নিদৃষ্টি হেনে এগিয়ে এসে সোজা বক্সের দিকে তাকিয়ে 'সধবার একাদশী'-র নিমচাঁদের সংলাপ বলেন-" তুই ব্যাটা আর বিদ্যে খরচ করিসনে। তোর বাপ ব্যাটা বিষয় করেছে, বসে বসে খা, পাঁচ ইয়ারকে খাওয়া, মজা মার। হেয়ার সাহেবের স্কুলে তোর কোন্ বাবা পড়েছিল? তুই কোন ক্লাসে পড়েছিস?" অটলবেশী জলদ বেণীর বলার ভঙ্গিতে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তবুও সংলাপ বলে, 'In the Baboo's class.' উত্তরে বেণী (নিমচাঁদ) বলে, 'Rather in the king's hell!' নিমচাঁদের সংলাপ শুনে দর্শকেরা হেসে ওঠে।

বীরকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ ও জ্বালা প্রশমিত হচ্ছে নিমচাঁদের সংলাপের মধ্য দিয়ে। বাবুদের মুখোশ খুলে দিতে পারছেন বেণীমাধব। এরপরে বেণী আরও বেসামাল হয়ে পড়েন। অন্য চরিত্রেরা পার্ট বলছে। বেণী বলছে না। বেণী হঠাৎ নিমচাঁদের চরিত্র এবং সংলাপ থেকে সরে আসে। বেণীমাধবের অন্তরের জ্বালা ও সংলাপ একাকার হয়ে যায়। বেণীর বিভ্রান্তিতে প্রেক্ষাগৃহময় গুঞ্জন ও উত্তেজনা দেখা দেয়। সাহেবরাও সশব্দে হেসে ওঠেন। এরপরেই বেণীর সংলাপ পরিবর্তন। 'সধবার একাদশী' থেকে 'তিতুমীর'-এ উত্তরণ। উপস্থিত দর্শকেরা বুঝে উঠতে পারে না। শুরু হয় গণ্ডগোল। চেঁচামেচি। বেণী তখন দর্শকদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলতে থাকেনঃ

"যতদিন আমার দেশ পরপদানত, ততদিন কারুর নেই বিশ্রাম।" - হট্টগোল বেড়ে চলে। বেণী আরও চেঁচান। এরপর বেণী গলার রুমাল খুলে মাথায় বাঁধেন, চাদরটা কোমরে। বোঝা যায়, নিমচাঁদ বেশী বাবুর পোশাক পরিবর্তিত হচ্ছে প্রতিবাদী কৃষকনেতা তিতুমীরের আদলে। স্টেজে নিমচাঁদ রূপান্তরিত হচ্ছে তিতুমীরে। প্রথমে কথায়, তারপরে সংলাপে, এরপর বেশভূষা ও আচরণে। তারপর উন্মুক্ত টিনের তরবারি।

সহ-অভিনেতারা তাকে সতর্ক করে, বেণী থামে না। শুরু করে তিতুমীরের সংলাপ। যা কিনা ক'দিন আগেই ড্রেস রিহার্সাল পর্যন্ত করে মহড়া দিয়ে তৈরি করেছেন ঃ

"সাহেব তোমরা আমাদের দেশে এলে কেনে? আমরা তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করিনি। আমরা তো ছিলাম ভায়ে ভায়ে গলাগলি কর্যে, হিন্দুমুসলমানের প্রীতির বাহু বেঁধে, বাংলাদেশের শ্যামল অঞ্চলে মুখ ঢেকে। হাজার হাজার কোশ দূরে এদেশে এসে কেনে ঐ বুট জোড়ায় মাড়গে (য়্যে) দিলে মোদের স্বাধীনতা?" বেণীমাধবের এই মানসিক পরিবর্তন ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি প্রথমে বুঝতে পারে বসুন্ধরা। ছুটে ঢুকে পড়ে মঞ্চে বেশ পরিবর্তন করতে করতে। 'সধবার একাদশী'র কাঞ্চন থেকে 'তিতুমীর'-এর ফতেমা চরিত্রে। সাজো সাজো রব ওঠে। দৃশ্যসজ্জা পরিবর্তিত হয় মুহূর্তে। কোট টুপি পরে জলদ 'তিতুমীর' নাটকের মাগুয়ার সাহেবের চরিত্র ধারণ করে। 'তিতুমীর' নাটক শুরু হয়ে যায়। প্রেক্ষাগৃহ কেঁপে ওঠে দর্শকের জয়ধ্বনিতে।

তিতুমীরের সংলাপ ঃ

"দুঃখের কাহিনী? মা আমি তিতুমীর, দেশের মাটি মুঠিতে ধর‍্যে এই শপথ নিই।" এবারে দর্শকাসন থেকে ল্যাম্বার্ট সাহেব আপত্তি করে ওঠে – 'স্টপ দিস'। থামে না বেণী। বলে চলে ঃ

"যতক্ষণ এক ফিরিঙ্গি শয়তান দেশের পবিত্র বুকে পা বেইখে দাঁড়গে (য়্যে) থাকবে, ততক্ষণ এই ওয়াহাবি তিতুমীরের তলোয়ার কোষবদ্ধ হবে নে কখনো।"

মাগুয়ার সাহেবকে দেখিয়ে কামিনী বলে, "তিতু। এই–এই নরাধমই আমাকে ধর্ষণ করেছিল। এই মুখ–এই সে। এই হচ্ছে লেপ্টেনান্ট মাগুয়ার। আমার সতীত্ব নাশ করেছিল এই দস্যু।"

টিপ্পনী

বেণী ঃ

"এই! এই মাগুয়ার! মাগুয়ার! তোমারেই খুঁজে ফিরি বারাসাতে, নারকেলবেড়িয়ায়। যত নারীর সর্বনাশ করেছ, যত চাষীরে চাবুক মেরে হত্যা করেছ, সকলের প্রতিশোধ আজ আমার এই বাহুতে এসে জমা হয়েছে।"

এবারে দর্শকাসন থেকে আপত্তি জানিয়ে ল্যাম্বার্ট সাহেব বলে ওঠেন ঃ "ইউ উইল পে ফর দিস! তাই সোয়ার ইউ উইল পে ফর দিস।" নাটক বন্ধ করার হুকুম দেন। বেণী কোনো আপত্তি শোনে না। তলোয়ার চালিয়ে মাগুয়ার বেশি জলদকে ফেলে দেয়। বলে ওঠে, "এই নাও ইংরাজ দুষমণ! এই নাও নারীধর্ষক ইংরাজ হার্মাদ। আজ বছরের পর বছর আমার দেশরে যা দিয়েছ, এই নাও তার খানিক ফেরৎ নাও!"

জয়ের হাসি মুখে নিয়ে বেণী হাঁফাচ্ছে। বসুন্ধরা এসে তাকে নমস্কার করে। গায়ক–অভিনেতা যদু গেয়ে ওঠে, 'তিতুমীর' নাটকের গান, পরাধীনতার জ্বালার গান। মাইকেলের রচিত গানটি প্রিয়নাথ তার নাটকে ব্যবহার করেছিল ঃ

"শুন গো ভারতভূমি। কত নিদ্রা যাবে তুমি
উঠ ত্যজ ঘুমঘোর। হইল, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।"

ল্যাম্বার্টের রক্তচক্ষুকে তুচ্ছ করে সমবেত কণ্ঠে কেঁপে ওঠে প্রেক্ষাগৃহ।

প্রথম দৃশ্য থেকেই ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে শেষ দৃশ্যে চরম প্রতিবাদের ভাষা ধ্বনিত হয়। শেষদৃশ্যে দেখি, মঞ্চের সামনে দর্শকাসনে দুই প্রতিরোধী শক্তি বসে আছে। থিয়েটারের মালিক বীরকৃষ্ণ দাঁ এবং দেশের মালিক ইংবাদ প্রতিভূ ল্যাম্বার্ট সাহেব।

□ 'টিনের তলোয়ার' ঃ রাজনৈতিক নাটক

রাজনৈতিক নাটকের মূল লক্ষ্য রাজনৈতিক ঘটনার ছবি আঁকা নয়। রাজনৈতিক নাটকের কাজ হলো জীবন্ত মানুষকে নিয়ে। বাইরের সমাজ জীবনের মধ্যে যে ঘটনাগুলির আবর্তে মানুষ বেঁচে থাকে, শুধুমাত্র তার বর্ণনা নয়। প্রখ্যাত তাত্ত্বিক ও সমালোচক র‍্যালফ ফক্স দেখিয়েছেন যে, কোনো ধর্মঘটের ঘটনা, সামাজিক আন্দোলন, সমাজদ্বন্দ্বের বিকাশ, বিপ্লব বা গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি

বর্ণনার মধ্যেই লেখকের সব উদ্যম শেষ করলে চলবে না। সামাজিক পটভূমিকা এবং সেই পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশমান ও পরিবর্তমান মানুষের কথাই বলতে হবে। তবেই তা রাজনৈতিক নাটকের মর্যাদা পাবে।

থিয়েটার বা নাটক যখন কোনো একটি ভাবনা বা মতাদর্শকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থান থেকে হয় সমর্থন, নয় আক্রমণ করে, তখনই সেটি রাজনৈতিক নাটক বা থিয়েটার হয়ে ওঠে। এই থিয়েটারে রাজনৈতিক ভাবনা যে ভাবেই থাক না কেন, সোচ্চার বা নিরুচ্চার, সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয়, তা কিন্তু দর্শক-পাঠক মনে বিশেষ একটি ভাবনারই উদ্রেক করে দেয়। থিয়েটারের দর্শক যখন জনতায় পরিণত হয়ে জনগণে সমুপস্থিত হয়, তখন এই ভাবনা তার রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং অংশগ্রহণের মধ্যে কার্যকরী হয়।

টিপ্পনী

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত সমাজবিপ্লবের যে রাজনীতি, উৎপল দত্ত তারই ধারক ও বাহক হতে চেয়েছিলেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারতবর্ষ, বিশেষ করে, আধা-ঔপনিবেশিক আধা-ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা ভারতবর্ষ, সেখানকার পরিসীমিত কাঠামোয় বেড়ে ওঠা প্রগতিশীল আন্দোলনের সংগ্রামী দোসর ছিলেন অক্লান্ত উৎপল দত্ত। তাই তাঁর নাট্যসৃজনে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সেখানেই মানুষের উপর মানুষের, কিংবা শাসনের অথবা অনুশাসনের অত্যাচার - উৎপল সেখান থেকেই তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করেছেন। সে কাহিনি এদেশ কিংবা বিদেশ - সেখানকারই হোক না কেন, সমকাল কিংবা অতীত - যাই হোক না কেন, তাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। তিনি শুধু মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের কাহিনিই বিবৃত করেননি - নানা অত্যাচার-অবিচার-প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করতে করতে মানুষই শেষ পর্যন্ত কীভাবে ইতিহাস তৈরি করে সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের সেই কাহিনি তিনি নাটকে বিবৃত করেছেন। বাংলায় উৎপল দত্তই প্রথম নাট্যকার যিনি বিষয়বস্তু হিসেবে রাজনীতিকে তাঁর সমগ্র নাট্যরচনায় স্থান দিয়েছিলেন। এতদিন বাংলা থিয়েটারে চালু নীতি ছিল - রঙ্গমঞ্চ ও নাটক হবে সমাজের দর্পণ। উৎপল দত্তের কাছে নাটক ও রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠল সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। সেখানে কোনো ফাঁকি ছিল না, আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তিনি তাঁর থিয়েটার ও নাটকের লড়াই বেশ বীরের মতোই লড়েছেন।

১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটারের দায়িত্ব গ্রহণ করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়! তাদের আগ্রহেই ব্রিটিশ-বিরোধী নাটক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অভিনয় করা হয়। এই নাটকে অত্যাচারি নীলকর সাহেবদের দেখানো হয়েছে এবং তাদের উপর কৃষকদের দৈহিক আক্রমণ ও হেনস্থা দেখানো হয়েছে। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে গ্রামবাংলার কৃষকেরা কীভাবে পর্যুদস্ত হচ্ছে তার দলিলচিত্র নীলদর্পণ নাটক। এদেশের ইংরেজ শাসকরা তখন থেকেই সতর্ক হয়ে পড়েন এবং এই নাটক বা এই জাতীয় নাটকের প্রকাশ এবং অভিনয় বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে তৎপর হয়ে পড়ে। অথচ হাতে কোনো উপযুক্ত আইন না থাকাতে ইংরেজ শাসকের অসুবিধে হচ্ছিল। হুমকি এবং অত্যাচার করে কতদিন আর বাঙালিকে নিরস্ত রাখা যাবে। এর মধ্যেই জারি হয়েছে 'অস্ত্র নিরোধক আইন'। এর পরেই চালু হয়েছে 'প্রেস অ্যাক্ট'। প্রথমটিতে অস্ত্র ব্যবহার এবং দ্বিতীয়টিতে বক্তব্যপ্রকাশ - দুটিই বন্ধ করে দেওয়ার আইন জারি করেছে ব্রিটিশ সরকার।

সব কয়টি আইনই ঔপনিবেশিক শাসনে পরাধীন ভারতবাসীকে নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় করে

রাখার চেষ্টা। এর পরে পরেই উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী', 'শরৎ সরোজিনী', গজদানন্দ ও যুবরাজ ইত্যাদির নাটকাভিনয় শুরু হয়ে গেলে ইংরেজশাসক ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং এইসব নাটক বন্ধ করে দেওয়ার উপায় ভাবতে থাকে। তারই পরিণতিতে 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে অর্ডিন্যান্স জারি করে এই জাতীয় ব্রিটিশ-বিরোধী নাটকাভিনয় বন্ধ করে দেওয়ার ফতোয়া জারি হয়। তারপর 'বিল' (Bill) আকারে কাউন্সিলে এনে একেবারে পুরোপুরি আইনে রূপান্তরিত করা হয়। ১৮৭৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই আইন বলবৎ হয়।

টিপ্পনী

বাংলা নাটক ও থিয়েটারের উপর ব্রিটিশ শাসকের আক্রমণের সময়টাই হচ্ছে 'টিনের তলোয়ার' নাটকের ঘটনাকাল। ১৯৭১-এ বসে উৎপল দত্ত নাটক লিখছেন একশো বছর আগেকার ১৮৭৫-৭৬-এর বাংলা থিয়েটারের কাহিনি। সমাগত অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রেক্ষিতে বসে পরাধীন ভারতের এক নাট্যকর্মী বেণীমাধবের প্রতিবাদের ভাষা রূপ পাচ্ছে, একশো বছর পরের আর-এক প্রতিবাদী নাট্যকর্মীর কলমে। নাটকের শেষ দৃশ্যে তাই দেখি, থিয়েটারের মালিক বীরকৃষ্ণ দাঁ এবং দেশের মালিকের প্রতিনিধি লাম্বার্ট সাহেবের উপস্থিতিতেই বেণীমাধব 'সধবার একাদশী' নাটকাভিনয় শুরু করে। যে নাটকে মালিক বীরকৃষ্ণদের বাবু শ্রেণিকে গালাগাল দেওয়া হয়েছে। এই নাটক দিয়ে বীরকৃষ্ণ দাঁ-কে ঘায়েল করেছে। মনের জ্বালা জুড়িয়েছে। সেখান থেকেই শুরু হয়েছে 'তিতুমীর' নাটকের সংলাপ। যে তিতুমীর ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বাঁশের কেল্লা গড়ে মরণপণ মুক্তির লড়াই লড়েছিল।

উনিশ শতকে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে যে বিপ্লবী নাট্যকর্মীরা নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে ব্রিটিশের জহ্লাদের মুখোশ খুলে দিয়েছিল, বেণীমাধবেরা তাদেরই একজন। দেশ ও থিয়েটারের প্রতি দায়বদ্ধ এক থিয়েটারকর্মী। তবুও বেণীর পক্ষে হঠকারী হওয়া সম্ভব ছিল না। কেননা, এক দিকে তার উপরে রয়েছে তার থিয়েটারের লোকজনদের রুটিরুজির চিন্তা এবং অন্যদিকে তিতুমীর অভিনয় করলে সবার জেলে যাওয়ার এবং থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এসব ভাবনার পরিমণ্ডলে বেণী সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ও চাপ নিতে নিতে ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হচ্ছিল নাট্যকর্মীর প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের। পাড়ার লোক, সমাজপতি, থিয়েটারের মালিক, সংবাদপত্র, একশ্রেণির দর্শক - প্রতিবন্ধকতা যে সব দিক দিয়েই আসুক না কেন-শেষ লড়াইটাই যে আসল এবং শেষতম লড়াই, তা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। বেণীর ভিতরের বিদ্রোহীসত্তা এইভাবে ক্রমে ব্রিটিশ-বিরোধী সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে নাটকটিকে যথার্থ রাজনৈতিক নাটক হিসেবে গড়ে তোলে।

উৎপল দত্ত একশো বছর আগেকার ব্রিটিশ শাসনকালে পরাধীন ভারতে তথা বঙ্গ প্রদেশে নাট্যাভিনয়ের উপর যে নির্মম আঘাত নেমে এসেছিল, তার বিবরণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন যে নাট্যকর্মীরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানতেও পিছপা হয়নি, সেই ইতিহাস আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। এবং একশো বছর আগেকার পরাধীন দেশের এই ঘটনা যে একশো বছর পরে স্বাধীন দেশেও নিয়ত বহমান, তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান কালে টিনের 'তলোয়ার নাটকের' এখানেই প্রাসঙ্গিকতা। থিয়েটারে টিনের তলোয়ারের ক্ষমতা প্রবল। কিন্তু বিনা ব্যবহারে তাতেও যে মরচে ধরে যায়। নিয়ত ব্যবহারে তাই আবার শাণিত ইস্পাতের তরবারি হয়ে ওঠে। বাংলা নাটক ও থিয়েটার সেদিন নাটক ও নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের চেতনার বিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব নিয়েছিল। 'টিনের তলোয়ার' নিয়ে রঙ মেখে সঙ সেজে ছেলেমানুষি পালার দিন শেষ। থিয়েটারকে বলতে হবে বিদ্রোহের কথা। রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির

বিরুদ্ধে গণজাগরণের কথা। এইভাবে দর্শক যদি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে-তাহলেই দেশের মুক্তি আন্দোলন গণজাগরণের রূপ ধারণ করবে। আর থিয়েটারের টিনের তলোয়ার আর মেকি অস্ত্রের ঝনঝনা শোনাবে না। সেটি হয়ে উঠবে ইস্পাতের শাণিত তরবারি।

□ প্রথম দৃশ্যে বেণীমাধব ও মেথরের কথোপকথন-এর প্রয়োজনীয়তা

টিপ্পনী

সাতটি দৃশ্য সমন্বিত নাটক 'টিনের তলোয়ার' তার প্রথম দৃশ্যেই আমরা বেণীমাধবের সঙ্গে মেথর মথুরের কথোপকথন দেখতে পাই। শেষ যামিনীতে টিমটিমে গ্যাসের আলোতে বেণীর সঙ্গে মেথরের সংলাপ শুরু হয়। সমালোচক শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার ঘোষ মহাশয়ের এই অংশটি পছন্দ হয়নি। তাঁর মন্তব্য ঃ

"নাটকের মধ্যে একটি মেথরকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়া তাহার সহিত নাটক ও নাট্যশালা সম্পর্কে যেসব কথোপকথনের উপস্থাপনা করা হইয়াছে তাহা যেমন বিরক্তিকর, তেমনিই হাস্যকর।" ('বাংলা নাটকের ইতিহাস', ৭ম সংস্করণ, আগস্ট ১৯৮৫ পৃঃ ৪৪৪)

অথচ প্রথম দৃশ্যে দুজনের কথোপকথনের এই অংশটিই তো সমগ্র নাটকের চাবিকাঠি। নাটকটির মূলদ্বন্দ্বের ভাবনার সূত্রপাত এখান থেকেই।

বেণী।। আপনি থিয়েটার দেখেন?
মেথর।। না।
বেণী।। কেন?
মেথর।। বুঝি না।

বেণীমাধবের মতো নাটকের লোকেরা তথাকথিত বাবুসমাজের জন্য যেসব নাটক লিখে তার অভিনয় করে চলেছেন, তার সঙ্গে সমগ্র দেশের সাধারণ মানুষের কোনো যোগ নেই। এই মেথর কোলকাতার নীচের তলায় থাকে। ম্যানহোলের ভিতরে আঙুল দেখিয়ে বুঝিয়ে দেয়, তার অবস্থান কোথায়। সে মাইকেল মধুসূদনকে চেনে না, তাঁর কাব্য তার কাছে 'জঘন্য' বলে মনে হয়। বাবুদের থিয়েটারও সে দেখে না। আর তাই সে 'বাংলার গ্যারিক'কে চেনে না, চেনার দরকারও নেই। বাবুদের এসব নাটক নিয়ে তার কোনো উৎসাহ নেই। কারণ, তাদের নীচুতলার জীবনের কোনো কথা এসব নাটকে থাকে না। বেণীমাধবের বর্তমান 'ময়ূরবাহন' নাটকে রয়েছে কাশ্মীরের যুবরাজের প্রণয় কথা।

মেথর মাথুর নীচুতলার নিম্নশ্রেণির মানুষ হয়ে বাবু ও ব্রাহ্মণের প্রতি তার স্বাভাবিক শ্রেণিঘৃণা উগরে দিয়েছে। সেই বাবু ও বামুন বেণীমাধবের তৈরি করা থিয়েটার মেথরের স্বাভাবিক কারণেই পছন্দ হবে না। নাট্যকার উৎপল দত্ত মেথর ও বেণীমাধবের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাটকের গোড়াতেই সমাজের দুই স্তরের তথা শ্রেণির মানুষের ভাবনার ও সংস্কৃতির স্তরভেদ করে নিয়েছেন। ইউরোপীয় সংস্কৃতির দাপটে এ দেশের যাত্রা, কবিগান, আখড়াই গান, খ্যামটা, ঝুমুর, রামলীলা, কথকতা, পাঁচালী প্রভৃতি বাঙালির নিজস্ব গ্রামীন সংস্কৃতির ক্রমশ অবহেলিত হতে হতে নির্জীব হয়ে পড়তে থাকে। 'টিনের তলোয়ার' নাটকের সময়কালে (১৮৭৫-৭৬) বাবুশ্রেণি থিয়েটারে

মত্ত। আর সাধারণ মানুষ তখনও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে মনের ও প্রাণের আনন্দের সন্ধান করে চলেছে।

নাটকের পরবর্তী অংশে তারই বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। উনিশ শতকের নবজাগরণের তথাকথিত কিছু আলোকিত অধ্যায়ের পাশে নীচের তলার অসংখ্য মানুষের অন্ধকার অধ্যায় চাপা পড়ে থাকে। মেথর তাকেই 'ধাপ্পা' বলে ব্যঙ্গ করে। বাবুদের থিয়েটারকে তার 'ধাপ্পা' বলেই মনে হয়। মেথর বেণীকে বোবুশ্রেণির বলে মনে করলেও সে তথাকথিত বাবুশ্রেণির নয়। বাবুদের ওপর রাগ তার প্রথম থেকেই ছিল। মেথরের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যেই আমরা জেনে গেছি বেণীমাধব যেখানে থিয়েটার করে তার মালিক বীরকৃষ্ণ দাঁ। এই বীরকৃষ্ণের প্রতি তার অপরিসীম ঘৃণা ও ক্রোধ ঃ

"ব্যাটার ক-অক্ষর গোমাংস, যেখানে যাবে পেছনে মোদাগাড়ি ভরা বোতল চলে, সে শালা হলো স্বত্বাধিকারী। আর আমি বাংলার গ্যারিক, ঐ, ঐ বেনে মুৎসুদ্দির সামনে আমাকে গলবস্ত্র থাকতে হয়।"

অন্যদিকে 'বামুন' হিসেবেওতার যে খুব একটা জাত্যাভিমান রয়েছে তা-ও নয়। তার কথা ঃ 'আমি বামুন নই। আমার জাত হচ্ছে থিয়েটারওয়ালা।'

মেথরের সঙ্গে বেণীর কথোপকথনে তখনকার থিয়েটারের তিনটি সমস্যা আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। (ক) মুৎসুদ্দি-বাবু ও মালিকদের নিয়ে সমস্যা, (খ) বামুনদের নিয়ে সমস্যা, (গ) বাবুদের থিয়েটার থাকে না নীচুতলার সাধারণ মানুষের কথা, তার সমস্যা। বাংলা থিয়েটারে চলছে রঙরঙ মেখে রাজাগজা সেজে টিনের তলোয়ার নিয়ে ছেলেমানুষি। মেথর বলেছিল ঃ

"যা আছে তাই সাজো না! গায়ে বিষ্ঠা আর কাদা লেগে আছে দেখছো না? - সেটা দেখাতে লজ্জা হয় বুঝি?"

এখান থেকেই বোঝা যায়, উনিশ শতকের থিয়েটারের লড়াইয়ের সূত্রপাত কোথা থেকে শুরু হচ্ছে।

প্রথম দৃশ্যে মথুর যে অনুযোগ বেণীকে করেছিল, পরের দৃশ্যে প্রিয়নাথ যে অভিযোগ বেণীর বিরুদ্ধে তুলেছিল-ক্রমে তা একাকার হয়ে বেণীর থিয়েটারের পরিমণ্ডলকে পরিবর্তিত করেছে। নীচুতলার মেথরের ভাবনাই যখন প্রিয়নাথের কথা হয়ে বেণীকে আঘাত করে, তখন দেখি, বেণীর উপলব্ধি তার 'ময়ূরবাহন' নাটক সম্পর্কে ঃ

"এমন ওঁচা নাটক কোন শালা ধরে! ....এ শালার নাটকে নেই এমন জিনিস নেই। আমি মড়া কেন যে এটা ধরলাম।"

প্রিয়নাথ এবার মনে করিয়ে দেয় যে, সে-তো গত দু-মাস ধরে এই কথাটাই বেণীকে বলে বুঝিয়ে আসছে।

নাটকের প্রথম দৃশ্যেই বেণীমাধব ময়নার কণ্ঠে গান শুনে তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মেথরের কাছ থেকেই তার পরিচয় পায়। পরবর্তী সময়ে ময়নার সঙ্গে বেণীমাধব তথা দর্শকের সংযোগ ঘটে এই মথুর মেথরের মাধ্যমেই। নাটকের শুরুতেই বেণীমাধব ও মেথরের কথোপকথন হাস্যোদ্রেক করলেও, কখনোই তা হাস্যকর কিংবা বিরক্তিকর নয়, অপ্রয়োজনীয়ও নয়। দুজনের

টিপ্পনী

কথোপকথনের মধ্য দিয়ে একশো বছর আগেকার বাংলা থিয়েটারের মানসিকতা ফুটে বেরিয়েছে। বাবু কালচারের থিয়েটারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক এবং দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গে আমাদের দৃষ্টি একাগ্র হয়ে ওঠে নাট্যপ্রস্তাবনার এই দৃশ্যে। প্রথম দৃশ্যের সূত্রপাত বেণীমাধব ও মেথর মথুর কথোপকথনের মুখবন্ধের মধ্য দিয়ে যা নাটকের মূল উদ্দেশ্যকে সঙ্কেতিত করেছে। এখানেই প্রথম দৃশ্যে এই দুজনের কথোপকথন অংশের সার্থকতা।

টিপ্পনী

□ 'টিনের তলোয়ার' ঃ চরিত্র বিচার

বেণীমাধব ঃ

উনিশ শতকের শেষার্ধের বাংলা থিয়েটার ও নাট্যাভিনয়ের পরিমণ্ডলে বেণীমাধবকে নাট্যকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে যুগের গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষকের কোনো-না-কোনো আদল বেণীমাধবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। সে যুগের একজন একনিষ্ঠ থিয়েটারকর্মী কীভাবে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে তার নাট্যকর্ম চালিয়ে গিয়েছিল, তার পরিচয় যেমন রয়েছে বেণীর মধ্যে, তেমনি রয়েছে ব্রিটিশ পরাধীন ভারতবর্ষে সেদিন নাট্যকর্মীরা জীবন ও পেশার ঝুঁকি নিয়ে কত বড়ো নাট্যকর্ম করেছিল, এবং ব্রিটিশ শাসক ও শোষকের অত্যাচারের নগ্ন মূর্তি উন্মোচন করে দিয়েছিল তাদের নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে। নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন চালু করে বাংলা থিয়েটার ও নাটকের কণ্ঠরোধ করে দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। শাসনের এই বেড়াজালের মধ্যেও সেদিন নাট্যকর্মীরা কী অকুতোভয়ে এই সব রক্তচক্ষুকে অস্বীকার করে জীবন ও থিয়েটারের ঝুঁকি নিয়েও ব্রিটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, এই নাটকে সেই যুগের বৃত্তান্ত বলতে গিয়েই উৎপল সৃষ্টি করেছেন বেণীমাধবকে। দেশপ্রেমের আগুন বুকে নিয়ে কী করে একজন নাট্যকর্মী সেদিন একের পর এক প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে বাংলা থিয়েটারকে বিদ্রোহের, বিপ্লবের থিয়েটারে পরিণত করেছিল, বেণীমাধব চরিত্র তারই ঐতিহাসিক নিদর্শন।

বেণীমাধব চরিত্রের দ্বন্দ্ব বহুমুখিন। নিজের কৃতকর্মের সঙ্গে তার নিজেরই দ্বন্দ্ব। তার ভাবনার সঙ্গে তার নাট্যদলের অন্যান্যদের দ্বন্দ্ব। বেণীমাধবের সঙ্গে তৎকালীন সমাজপতি তথা সমাজপ্রধানদের দ্বন্দ্ব। বেণীমাধবের সঙ্গে তার থিয়েটারের মালিক বীরকৃষ্ণ দাঁ-র দ্বন্দ্ব, এবং সর্বোপরি ঔপনিবেশিক শাসনে পরাধীন ভারতবর্ষের একজন দায়বদ্ধ নাট্যকর্মী হিসেবে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব।

বেণীমাধব যখন তার 'দি গ্রেট বেংগল অপেরা' নিয়ে থিয়েটার করা শুরু করেছে তখন ব্রিটিশ রাজশক্তির রক্তচক্ষু বাংলা নাটক ও নাট্যশালার উপর সঞ্চরমান। তাই 'দি গ্রেট বেংগল অপেরা'-র তরফে অভিনয় হচ্ছে 'ময়ূরবাহন' নাটকের। কাশ্মীরের রাজপুত্র-রাজকন্যাদের অলীকপ্রেমের কাহিনি। রাজপরিবারের গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতা দখল। টিনের তলোয়ার নিয়ে থিয়েটারের নামে এই ছেলেমানুষিকে ধিক্কার দিয়েছে সমাজের নীচুতলার মানুষ, একজন মেথর। তার সাফ জবাব ঃ 'যা আছে তাই সাজো না। সমাজের নীচুতলার বিষ্ঠা আর কাদা গায়ে লেগে আছে দেখছো?'

নীচুতলার সাধারণ মানুষটি 'থিয়েটারওয়ালা' বেণীমাধবের মনে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল, তা-ই অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে প্রিয়নাথ। সে উঁচুতলার মানুষ, কিন্তু শ্রেণি বিচ্যুত। সে বাবু কালচার ত্যাগ করেছে, পিতার বাবুয়ানিকে ছেড়ে এসেছে। প্রিয়নাথ 'পল্লাশীর যুদ্ধ' নামে ব্রিটিশ-বিরোধী নাটক লিখে জমা দিয়েছিল বেণীমাধবের কাছে। বেণী সে নাটক পড়েই দেখেনি। নাট্যদলের লোকেরা সেই পাণ্ডুলিপির কাগজ দিয়ে ঠোঙা বানিয়ে মুড়ি খাচ্ছে। আহত ক্ষুব্ধ প্রিয়নাথ চলে যাওয়ার সময় বেণীকে আঘাত হেনে যায়। বেণীকে তা আবার নতুন করে ভাবায়।

অন্যদিকে মজুতদার ইন্দ্র সাহার চালের আড়ত থেকে চালানের জন্য জাহাজ ঘাটার দিকে চাল নিয়ে যাওয়ার সময় ভিখিরির দল সেইসব চালের বস্তায় খাবলা মারতে গিয়েছিল। সাহেব আর গোরা সৈন্যরা তাদের ধরে পেটাচ্ছে। আবার এদিকে চাপাতলা, হাড়কাটা, মেছোবাজারে গোরার দল কালোমানুষদের মেরে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে। এইসব খবর বেণীকে দিয়ে প্রিয়নাথ বলেছিল; "যখন আপনি অকিঞ্চিৎকর একটা নাটকে আচাভুয়া সং-এর মতো লাফাচ্ছেন, ওদিকে আমার দেশবাসী প্রহৃত হচ্ছে।" তারপরই প্রিয়নাথ মোক্ষম আঘাত হেনেছিল বেণীর মর্মস্থলে ঃ 'রোম পুড়িতেছে আর সম্রাট ব্যায়লা বাজাইতেছেন।' চারদিকে যখন সমাজ ধ্বস্ত হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনের শোষণে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে - সমাজের চারিদিকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে চলেছে - তখন নাট্যকর্মীরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে কেন? -এইসব ঘটনা ও তার আঘাত বেণীকে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত করে তুলেছিল। বেণীকে এসব কথা নতুনভাবে ভাবিয়েও তোলে। কিন্তু নাট্যদলের বিপদ ডেকে এনে ব্রিটিশের রক্তচক্ষুর সামনে পড়ে জেলে যাওয়াকে সে যথাযথ কর্ম বলে মনে করে না। প্রথমত, সে নিজের নাট্যদলকে বাঁচাতে চায়। দলের সঙ্গে যুক্ত এতগুলো লোকের খেয়ে পরে বাঁচার নিরাপত্তার কথা তাকে ভাবতে হয়। দ্বিতীয়ত, নাটকাভিনয় করে সে নাম করতে চায়, খ্যাতি পেতে চায়। জেলে যাওয়াটা তার কাছে হঠকারী সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়েছে। এইখানেই নাট্যকর্মী হিসেবে বেণীর ভাবনার জগতে ও কর্মকাণ্ডের জগতে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়।

এই সময়েই সমাজভাবনার যে দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে হচ্ছে বেণীকে, তা সেই যুগ-সঞ্জাত। ১৯৭৩-এর পরের বাংলার নাট্যদলগুলিকে সে যুগের সমাজপতিরা ঘৃণার চোখেই দেখে এসেছে। বিশেষ করে, বঙ্গ মঞ্চে অভিনেত্রী গ্রহণ করা হলে, সমাজপতিদের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তখন মঞ্চে যেসব মেয়ে অভিনয় করতে এসেছিল তারা কেউ ভদ্রসমাজ থেকে আসেনি। তারা সমাজে অপঙ্‌ক্তেয়, বারাঙ্গনা পল্লীর মেয়ে। নদেরচাঁদ বাচস্পতি সাজগোজ করা অভিনেত্রী ময়নাকে দেখে বলেছিল ঃ "এই রমণী ভদ্রলোকের কন্যা হইয়া কুলমান ভুলেছে। কলকেতার হিন্দু সমাজের জাত মাল্লে, ধর্মনাশ কল্লে। এক্‌টো করছে। এস্টেজে মদ খেয়ে পুরুষের সংগে নাচছে।" বেণীমাধবকে লড়াই চালাতে হয়েছে এই সমাজপতি ও সমাজমাথাদের বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে বেণীমাধবকে থিয়েটার চালাতে গিয়ে থিয়েটারের মালিক বীরকৃষ্ণ দাঁ-র সামনে গলবস্ত্র থাকতে হয়। যদিও এই মালিক বীরকৃষ্ণ সম্পর্কে অশেষ ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা রয়েছে বেণীর মধ্যে।

বীরকৃষ্ণ ব্যবসায়ী। কিন্তু নাটকের জগতের কেউ নয়। পয়সার জোরে তিনি থিয়েটারের মালিক হয়েছেন। থিয়েটার চালানোর জন্য এই সব মুৎসুদ্দিদের ওপরই নির্ভর করতে হয়। আর তাই, বীরকৃষ্ণের লালসা ও লোভের আগুনে যেমন নিজ হাতে তৈরি করা ময়নাকে তুলে

টিপ্পনী

দিতে হয়েছে, তেমনি নিজের থিয়েটার ভাবনাকে পদে পদে মালিকের ইচ্ছে-অনিচ্ছের দাবির কাছে বিসর্জন দিতে হয়েছে।

ময়নাকে বীরকৃষ্ণের রক্ষিতা হতে দিয়ে বেণীমাধব যখন নিজের ভিতরে নিজের ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, তখনই প্রিয়নাথ বক্তৃতার ঢঙে বলে উঠেছে ঃ

"যতদিন আমার দেশ পরপদানত, ততক্ষণ কারুর নাই মুহূর্তেকের স্বস্তি বা বিশ্রাম। কলিকাতার রাজপথে বাংলার কৃষকের রক্ত করিলে তাহা আমারই রক্ত ঝরিল। সুদূর দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠে নিহত কোনো বিদ্রোহী সিপাহী, সে আমারই চূর্ণ বক্ষপঞ্জর।"

টিপ্পনী

ব্রিটিশের মুৎসুদ্দি বীরকৃষ্ণ দাঁ-র হাতে ময়নার জীবনলাঞ্ছনা মুহূর্তেই ব্রিটিশের হাতে ভারতমাতার লাঞ্ছনার প্রতিরূপে মিশে যায়। কিন্তু নিজের বেষ্টনীর জালে বেণীমাধব এমনই জড়িত যে, সে সব কিছু বুঝে উঠলেও, হৃদয়দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হলেও, একেবারে মুখোমুখি ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হতে পারছে না। আর তাই প্রিয়নাথের লেখা 'তিতুমীর' নাটকের অভিনয় বন্ধের ঘোষণা করতে প্রাকারান্তরে বাধ্য হয়েছে বেণী। কিন্তু 'সধবার একাদশী' অভিনয়ের সময় নিমচাঁদের সংলাপের মধ্য দিয়ে বীরকৃষ্ণকে আক্রমণ করতে করছে বেণী প্রবেশ করে গেছেন 'তিতুমীরে'র সংলাপে। আর 'সধবার একাদশী'র মঞ্চ মুহূর্তেই 'তিতুমীরে'র মঞ্চে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। দর্শকাসন থেকে ল্যাম্বার্ট-এর সক্রোধে নাটকাভিনয় বন্ধ করে দেবার হুংকারের জবাব বেণী তলোয়ার বের করে আঘাত করে মাগুয়াররূপী জলদকে - "এই নাও ইংরাজ দুষমণ! এই নাও নারী ধর্ষক ইংরাজ হার্মাদ। আজ বছরের পর বছর আমার দেশরে যা দিয়েছে, এই নাও তার খানিক ফেরৎ নাও।" বেণীমাধবের ভিতরের বিদ্রোহীসত্তা এইভাবে ক্রমে ব্রিটিশ-বিরোধী সত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে।

উনিশ শতকে থিয়েটারের ইতিহাসে যে প্রতিবাদী নাট্যকর্মীরা নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে ব্রিটিশ জহ্লাদের মুখোশ খুলে দিয়েছিল, বেণীমাধব তাদেরই একজন। দেশ ও থিয়েটারের প্রতি দায়বদ্ধ এক থিয়েটার কর্মী। বেণীমাধব চরিত্রের বিকাশ নাট্যকার সেই সময়কালের প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করে, সেই সময়কার একজন নাট্যকর্মীর জ্বলন্ত দেশপ্রেম, দ্বিধা, থিয়েটারের প্রতি আসক্তি ও ভালোবাসা, তার সীমাবদ্ধতা, পরিপ্রেক্ষিতের প্রতিবন্ধকতা পরতে পরতে খুলে দেখিয়েছেন। প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে সমঝোতা, আবার একসময়ে সোচ্চার প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়া-নিরন্তর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে বেণীমাধবের চরিত্রের বিকাশ ঘটিয়ে তুলেছেন।

ময়না ঃ

ময়না ছিল একেবারেই নিম্নশ্রেণির মানুষ। সে ছিল চাষির মেয়ে। দুর্ভিক্ষে গ্রাম থেকে উৎখাত হয়ে বাঁচবার তাড়নায় কোলকাতায় এসে আনাজপত্র বেচে গুজরান করত। মায়নাকে সেই অবস্থা থেকে তুলে এনে বেণীমাধব বানিয়েছিল থিয়েটারের অভিনেত্রী। ময়নার পুরনো রূপ, পুরনো পোশাক, পুরনো জীবন যাপন - পদ্ধতির প্রক্রিয়াগুলির পরিবর্তিত হয়ে গেল। নাটকের লোকদের মনে হয়েছিল যেন 'ফড়িং প্রজাপতি হয়েছে'। এই অবস্থানে তাকে দেখে তার পূর্বের সমশ্রেণির বাসিন্দা মেথর মথুর বলে উঠেছিল ঃ 'তুমি দেখছি মুচির কুকুরের মতো ফুলে উঠেছ।' ময়নার শ্রেণি অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণ ও ভাষাও পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

প্রথম অভিনয়ে নামার অভিজ্ঞতা ময়নাকে রাতারাতি অনেক সমৃদ্ধ করে দিয়েছে। দলের অভিজ্ঞ অভিনেত্রী বসুন্ধরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল ঃ 'ও আমার চেয়ে অনেক ওপরে উঠবে, বড়বাবু, অনেক অনেক ওপরে।'

প্রথম রাতের অভিনয়েই ময়না দুই শ্রেণির দর্শকের অভিনন্দন লাভ করেছিল। তখনকার থিয়েটারের সামনের সারির, মাতালবাবুদের দল এবং পিছনের সংখ্যাধিক্য সাধারণ মানুষ, দর্শকরূপী দেবতা। এখান থেকেই ময়নার জীবনভাগ্যের দ্বিতীয় স্তর শুরু হয়ে যায়।

টিপ্পনী

ময়নার এই নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠার পরিচয় আমরা নাটকে পেয়ে যাই। সমাজের ধনী শ্রেণির সঙ্গে তার ওঠা-বসা, মেলামেশা। 'বাংলাদেশে যত বাবু আছে সব হেড়াহেড়ি করতে লেগেছে।' ময়না তার স্বশ্রেণি থেকে উন্নীত হয়ে সমাজের মাথাওয়ালাদের ঘাড়ে চড়ে বসেছে। ময়না এই নতুনতর জীবনে যে ভাব্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, তাতে তার পুরনো জীবনে আর ফিরে যাওয়া যায় না। পথের ভিখিরিদের সে এখন আর সহ্য করতে পারে না। ফেলে আসা জীবনস্মৃতি পুরোপুরি ভুলে যেতে চায় সে।

বেণীমাধবকে নিজের থিয়েটার করে দেবার শর্তে মালিক বীরকৃষ্ণ ময়নাকে রক্ষিত করে রাখতে চায়। এখানে এসে ময়নার ভিতরের দ্বন্দ্ব আরও পরিস্কার হয়ে ফুটে ওঠে। বেণী ভিখিরি বলে তাচ্ছিল্য করলে ময়না জানায় ঃ

"ভিখিরি যখন ছিলাম, তখন তরকারি বেচে পেট চালাতাম। এখন এমন ভদ্রমহিলা বানিয়েছ, বাবু, যে বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া আর পথ নেই।"

প্রাথমিক আপত্তি থাকলেও সে পুরনো জীবনে ফিরে যেতে পারেনি। ময়নার নতুন জীবনে সুখ ও ঐশ্বর্যের এতই প্রাচুর্য যে, সব জেনেও, প্রিয়নাথকে হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেও, এখন সে আর প্রিয়নাথের সঙ্গে চলে গিয়ে নতুন জীবনে জড়াতে সাহস পায় না। নতুন জীবনের আকর্ষণ এবং পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতার টানাপোড়েনে ময়না ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে ঃ

"পারবো না। থিয়েটার ছাড়া বাঁচবো না। এরাই সব পিতামাতা, ভাইবোন, সব। এদের পথে বসিয়ে চলে যেতে পারবো না।"

এবং তার সর্বশেষ ঘোষণা ঃ 'আবার গরীব হয়ে যেতেও আমি পারবো না।' আর তাই প্রিয়নাথের আহ্বানে সে সাড়া দিতে পারেনি।

বীরকৃষ্ণ ধীরপদে এগিয়ে এসে ময়নাকে গ্রহণ করে। পরিয়ে দেয় মন্টিথের দোকান থেকে গড়িয়ে আনা দুল আর ব্রেসলেট। ময়না 'বিধুমুখী' টুকটুকি হয়ে চলে যায় মুৎসুদ্দি, রোগগ্রস্ত লম্পট বীরকেষ্টর রক্ষিত হয়ে। অর্থকৌলীন্যের জোরে সে আজ সমাজের মাথাদের কাছে 'মা ঠাকুরানী'। তবে নতুন জীবনে উন্নীত হয়ে যে সুখের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল তা-যে একেবারেই অলীক, ময়না তা বুঝতে পেরেছে। বীরকৃষ্ণের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করেছে, মার খেয়েও বারে বারে প্রিয়নাথের নাম করেছে। আবার 'গ্রেট বেংগল অপেরা'য় অভিনয় করতে গিয়ে বীরকৃষ্ণের উঠোনে খুজরো নাচতে রাজি হয়নি। বীরকৃষ্ণের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় যে বেণীমাধব চলেছে, সেখানেই ময়না প্রতিবাদ হানতে শুরু করেছে। বেণীমাধব 'তিতুমীর' বন্ধ রেখে 'সধবার একাদশী' অভিনয় করতে চাইলে ময়না প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে ঃ "এ থেটার এখন বড়লোকের উঠোন। বীরকেষ্টবাবুর উঠোন। এই কাপ্তেনবাবু সেই উঠোনে নাচবেন।" অভিমানে-ক্রোধে, অপমানে ক্ষিপ্ত ময়না

দম্ভভরে শ্লেষ মিশিয়ে বলে ওঠে ঃ "আমি বীরকেষ্টবাবুর পাটরানী। উঠোনে নাচি না। ভাড়াটে নাচের দলে থাকলে মান থাকে না।"

রাস্তার মেয়ে থেকে গৌরবছটার অভিনেত্রীর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ময়না, প্রিয়জন প্রিয়নাথের সঙ্গে চলে গিয়ে আবার দারিদ্র্যের জীবন যাপন করতে চায়নি। মালিক বীরকৃষ্ণের রক্ষিতা হয়েও থিয়েটার ছাড়েনি। পুরনো জীবন ছেড়ে এসে নতুন জীবনের হাতছানি, প্রলোভন, হতাশা, গ্লানি, ক্লেদ-অন্ধকার নানাদিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে ময়নাকে বেঁধে ফেলেছে। তার জীবনের চাওয়া-পাওয়ার কিছুরই হিসেব মেলে না। ময়না গোড়া থেকে যে মুক্তি চেয়েছিল, তার স্বরূপ সে বুঝে উঠতে পারেনি। নানা পরিস্থিতিতে সে নিজেকে গড়ে তুলতে তুলতে, মানিয়ে নিতে নিতেও, প্রতিবাদের যে কণ্ঠস্বর তৈরি করেছিল, শেষ পর্যন্ত তাই নাটকের শেষাংশে এসে দেশমাতৃকার মুক্তির মধ্য দিয়ে নিজের মুক্তি খুঁজে নেয়।

টিপ্পনী

সে যে সত্যি শেষ হয়ে যায়নি, তলিয়ে যায়নি, তা বোঝা গেছে নাটকের শেষাংশে এসে। তার সব অবস্থার টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে, সেই যুগ ও কালের নানা সংকটের মধ্য দিয়ে, ময়নার যে রূপ দেখি, তা তো নিঃসন্দেহে প্রতিবাদীর রূপ। ময়না থেকে শঙ্করী, শঙ্করী থেকে টুকটুকি-এইসব পর্যায় অতিক্রম করে, এবারে সে বঙ্গলক্ষীর ভূমিকায় নেমে পড়ে। শারীরিক ও মানসিকভাবে নিয়ত ধর্ষিতা ময়না বিদেশি ব্রিটিশের হাতে ধর্ষিতা ও বিধ্বস্তা দেশমাতৃকার প্রতিতুলনায় এসে যায়। 'তিতুমীর' নাটকের বঙ্গ-লক্ষীর ভূমিকায় কণ্ঠে দেশজননীর প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদে গান ধরে দেয় সে, সবজিওয়ালি ময়না, থেটারের রানি শঙ্করী, বীরকৃষ্ণ দাঁ-এর রক্ষিতা টুকটুকি - সব বন্ধনজ্বালার মুক্তি ঘটে দেশমাতৃকার স্বদেশপ্রেমের উদাত্ততায়। প্রতিবাদী ময়নার দৃপ্ত উচ্চারণ তাই নাটকের শেষ দৃশ্যে ব্যালকনিতে বসে দেশমাতৃকার বন্ধনমুক্তির সংগীতে উচ্চারিত হতে থাকে।

বীরকৃষ্ণ দাঁ ঃ

উনিশ শতকের ক্ষয়িষ্ণু ক্রমবিলীয়মান সামন্তবাদ এবং উদীয়মান ও বিকাশশীল ক্ষয়িষ্ণু ক্রমবিলীয়মান সামন্তবাদ এবং উদীয়মান ও বিকাশশীল পুঁজিবাদের মধ্যে বেড়ে ওঠা বেনিয়ে-ফড়ে দালাল-মুৎসুদ্দি সম্প্রদায়ের জীবন্ত চিত্র বীরকৃষ্ণ দাঁ। এরকম এক 'বাবু' যখন থিয়েটারের মালিক হন, তখন আর পাঁচটা ব্যবসার মতোই তার কাছে থিয়েটারও একটা ব্যবসা। উপরিলাভ থিয়েটারের অভিনেত্রীকে রক্ষিতা হিসেবে পাওয়া। চটকল, পাটকল, তেলকলের মতোই তাদের কাছে থিয়েটার-কলও একটা মুনাফা লাভের কল। এখান থেকে টাকা ও ফুর্তি আহরণই তার কাম্য। ব্যবসার ক্ষতি দেখলে সে ব্যবসা তিনি চালাবেন না। তার উপরে যে সাহেবদের দৌলতেই তার এত রমরমা, তাদের তিনি চটাতে চান না। বরং খুশি রাখতে চান।

বীরকৃষ্ণ সম্পর্কে বেণমীমাধবের উক্তি ঃ

"ব্যাটার ক-অক্ষর গোমাংস। যেখানে যাবে পেছনে মোদাগাড়ি ভরা মালের বোতল চলে। সে শালা হলো সত্ত্বাধিকারী।"

আর অন্যত্র উৎপল দত্তের অভিমত ঃ

"বুর্জোয়ারা তাদের নিরেট অর্থকরী চিন্তাভাবনা দিয়ে শিল্পের জগতে চড়াও হলে কী হয়,

ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা সেটা স্বচক্ষে দেখেছিল।"

উনিশ শতকের এই বীরকৃষ্ণ দাঁ-দেরই একজন নাটকের বীরকৃষ্ণ দাঁ।

নাটক শুরুর আগে বীরকৃষ্ণ হাঁক পাড়ে ঃ

"আপনাদের কাপ্তেনবাবুকে বলে দেবেন, ওর মত নাটুয়া পুষে রাখা আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। কড়ি যখন ফেলেছি, তেলও মাখবো।"

'সধবার একাদশী'কে বীরকৃষ্ণ কখনো 'বিধবার হবিষ্যি', কখনো 'সধবার হবিষ্যি' বলে। আবার কখনো 'বিধবার একাদশী' কখনো বা 'বিধবার উপবাস'। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে তার মন্তব্য ঃ

টিপ্পনী

"সে লিখতে জানে না। চূড়ান্ত রকমের অশ্লীল। তাছাড়া কলকাতার বাবুদের ব্যঙ্গ করেছে ও পালায়। আমাদের গাল দেবে আর আমারই টাকা ঢালবো, এমন মামাবাড়ির আবদার চলতে পারে না।"

তিনমাসে থিয়েটার থেকে আটত্রিশ হাজার টাকা উপার্জন হলেও তা বীরকৃষ্ণের কাছে লোকাসন হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে। তাই থিয়েটার ব্যবসা ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। শ্যামবাজারে তার যে গরবিলি জমিটুকু আছে তা বেংগল অপেরাকে দিয়ে দেবে বীরকৃষ্ণ। এবং বেংগল অপেরার নিজস্ব থিয়েটার তৈরির জন্য আট হাজার টাকা দেবে। স্বত্বাধিকারী হবে বেণীমাধব স্বয়ং। তবে এর বিনিময়ে বীরকৃষ্ণ শঙ্করী ওরফে ময়নাকে তার রক্ষিতা করে রাখতে চায়।

মালিক বীরকষ্ণের এমনই দাপট যে, নাটকাভিনয় চলাকালীনই সে নায়িকা শঙ্করীকে নিয়ে মঞ্চে ঢোকে। আবার বীরকৃষ্ণ যখন বুঝতে পারে তার দেওয়া থিয়েটারে তার সামনেই ইংরেজ-বিদ্বেষী নাটক 'তিতুমীর'-এর রিহার্সাল চলছে, তখনই তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছে। বেণী বীরকৃষ্ণকে থিয়েটারের বাইরের লোক বলে ফতোয়া দিলেও ইংরেজ তোষণকারী বীরকৃষ্ণ সদর্পে বলে ওঠে ঃ

"এ নাটক হতে পারছে না। বেণীবাবু, হচ্ছে না। এ নাটক সাহেবদের গাল দিয়েছে। যে সাহেবরা অশেষ কষ্ট সহ্য করে এদেশে এসে সতীদাহ নামক কুপ্রথা নিবারণ করে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে আমাদের সভ্য করলেন, এ নাটক সেই সাহেবদের গাল দিচ্ছে।"

'তিতুমীর' নাটক শেষ পর্যন্ত বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় বেণীমাধব। 'তিতুমীর' বন্ধ করাতে বীরকৃষ্ণের উল্লাসের কারণ এই নাটকটি প্রথমত ব্রিটিশ-বিরোধী এবং দ্বিতীয়ত তারই রক্ষিতা ময়নার প্রেমিক প্রিয়নাথের লেখা। ব্রিটিশ ভক্তি, ব্যবসাপ্রীতি ও ব্যক্তিগত ক্ষোভ-ঈর্ষা মিলে মিশে তার চরিত্রে একাকার হয়ে গেছে।

এই নাটকের ঘটনাকালের (১৮৭৬) সময়ে এইসব থিয়েটার মালিকদের সকলের উপস্থিতি ইতিহাসগতভাবে সম্ভব ছিল না। উৎপল দত্ত অপূর্ব কুশলতায় ইতিহাসের কিছু আগে-পরের মানুষগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে এসে, তাদের কিছু না কিছু চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও মহিমার সম্মিলনে তুলেছেন বীরকৃষ্ণ দাঁ-কে। এই মূর্তিমান লম্পট, ধূর্ত, নিরক্ষর, গোঁয়ার, অহংকারী, উদ্ধত, দাম্ভিক এবং সংস্কৃতি জ্ঞানহীন বীরকৃষ্ণ দাঁ তার চরিত্রমাহাত্ম্যে উনিশ শতকের একটি জীবন্ত

মুৎসুদ্দী বাবুশ্রেণির স্বরূপে হাজির রয়েছে এই নাটকে। এদের রুচিহীনতা, লালসা, লোভ এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হয়েছে উনিশ শতকের বাংলা বাণিজ্যিক থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত নাট্যকর্মীদের এবং এই নাটকে বেণীমাধব এবং অন্যদের। উনিশ শতকের নাট্যসংস্কৃতি বিকাশে এদের পুঁজির আনুকূল্য থিয়েটার কর্মীদের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এদের ব্যাপক উপস্থিতিতে যে প্রতিবন্ধকতা বারে বারে নির্মিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে উনিশ শতকের থিয়েটার কর্মীদের নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে।

টিপ্পনী

বীরকৃষ্ণ দাঁ উনিশ শতকের সেইসব দালাল মুৎসুদ্দি বেনিয়া বাবু, যারা প্রকারান্তরে ব্যবসায়িক থিয়েটারের মালিক হয়েছিল অন্য আর পাঁচটা লাভের ব্যবসা চালাবার আকর্ষণে এবং সহজেই নারীসঙ্গ লাভের কামনায়। কড়ি ফেলে তেল মাখতে চেয়েছিল তারা বাঙলা থিয়েটারের আঙিনায়। তাদেরই জীবন্ত একটা প্রতিমূর্তি বীরকৃষ্ণ দাঁ। গ্রেট বেংগল অপেরার স্বত্বাধিকারী।

তৃতীয় অধ্যায়

উপন্যাস - সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'

□ সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র ঃ

টিপ্পনী

শশধর খাঁ ভাদুড়ীর পুত্র ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে সমৃদ্ধতর জীবন-জীবিকার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর থেকে বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় পাড়ি দিয়েছিলেন। তাঁর বয়স তখন ছাব্বিশ। পূর্ণিয়াবাসী আত্মীয় ভুবনমোহন সান্যালের আগ্রহে এবং অনুপ্রেরণায় আইনের ছাত্র ইন্দুভূষণ পূর্ণিয়ার জেলা আদালতে আইনজীবী হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। তিনি বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন হরিমোহন লাহিড়ীর কন্যা রাজবালা দেবীর সঙ্গে। তাঁদের পাঁচ কন্যা ও তিন পুত্র সন্তানের মধ্যে সতীনাথ ছিলেন ষষ্ঠ সন্তান। ১৯০৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর পূর্ণিয়ার ভাট্টাবাজারে সতীনাথের জন্ম। তাঁর মেজদা ভূতনাথ ভাদুড়ী জানিয়েছেন ঃ

"পারিবারিক শিক্ষা ও কৃষ্টিকে উৎসাহিত করেছিএলন আমাদের ঠাকুরমা রামচনু লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রী। কৃষ্ণনগরে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন আরম্ভ হয়েছিল এবং আমাদের পারিবারিক motto ছিল Plain living and high thinking-এই পরিবেশেই মানুষ হয়েছিলেন সতীনাথ।"

বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে সতীনাথ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয় পূর্ণিয়ার অন্তর্গত ভাট্টার উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথ মন্ডলের প্রিয়পাত্র ও স্নেহভাজন ছিলেন সতীনাথ। এখান থেকে উচ্চ-প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পূর্ণিয়া জেলা স্কুলে ভর্তি হন। ১৯২৮ সালে তিনি ডিভিশনাল স্কলারশিপ সহ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ সালে তিনি পাটনা বিজ্ঞান কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হওয়ায় তিনি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে কলা বিভাগে চলে আসেন এবং সাম্মানিক অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হন। ১৯২৮ সালে তিনি অর্থনীতিতে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক হন। ১৯৩০ সালে ওই একই বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩১ সালে পাটনা আইন কলেজ থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯৩২ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সাত বছর সতীনাথ পিতার সহকর্মী হিসেবে পূর্ণিয়া আদালতে আইনজীবীর পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। আইন-চর্চার পাশাপাশি এই সময় তিনি সাহিত্য-চর্চাতেও উৎসাহী হয়ে ওঠেন। হিন্দি, উর্দু, জার্মান প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার প্রতিও তিনি আগ্রহী হন। পিতার নিজস্ব গ্রন্থাগারটি সতীনাথকে আইন-চর্চায় বিশেষ সাহায্য করেছিল। তাঁর তৈরি করা 'মিশিল' পড়ে পূর্ণিয়ার বার-লাইব্রেরিতে সিনিয়র উকিলেরাও বিস্মিত হতেন। তবে আইন-আদালতের বিষয় ও উকিলের কাজ তাঁর কাছে ক্রমশ বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়ে লাগতে শুরু করে। অন্তরঙ্গ বন্ধু বিভুবিলাস ভৌমিককে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ

"নেহাৎ লোকের দিন কাটছে বলেই আমার দিন
কাটছে এ কথা বললে একটু অত্যুক্তি করা হয় তবে
আমার কাটছে এই শতকরা ৮০ জন লোকের সাধারণ

বৈচিত্র্যহীন ভাবে যে রকম কাটে।"

টেনিস খেলা, তাসখেলা ও সাহিত্যচর্চা নিয়ে সতীনাথের দিন অতিবাহিত হচ্ছিল। এর মধ্যেই অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি যোগ দেন সক্রিয় রাজনীতিতে। ১৯৩৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর, সতীনাথ পূর্ণিয়া থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরে এক গ্রামে সর্বোদয় নেতা বৈদ্যনাথ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত টিকাপট্টি আশ্রমে যোগদান করেন। রাজনীতির কঠোর আত্মত্যাগের পথে তাঁর প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয় এই সশ্রম আশ্রমিক পরিবেশে। সতীনাথের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান প্রসঙ্গে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন ঃ

টিপ্পনী

"কাল কে বললে, সতু টিকাপট্টি গিয়েছে, Law practice
ছেড়ে দিলে, কথাটা বিশ্বাস হয় নি, আজ শুনছি সত্যই
সে কংগ্রেসে কাজ করবে তাই গিয়েছে। ওরূপ
Intellect-এর ছেলে চাকুরী কি Court attend করতে
উৎসাহ পায় না। তারা বরাবর aspiration পোষণ
করে, সাধারণে যা করে তাতে মন বসে না।"

বাবার নির্দেশে মেজদা ভূতনাথ টিকাপট্টি আশ্রমে গিয়ে সতীনাথকে বাড়ি ফিরে আসতে বললে তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দেন।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৮ -এই নয় বছর সতীনাথের রাজনৈতিক জীবন বিস্তৃত ছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি তিনবার কারাবরণ করেন। ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করার জন্য তিনি এক বছর হাজারিবাগ জেলে বন্দী ছিলেন। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয়বার ছয় মাসের জন্য এবং ১৯৪২-৪৪ সালে তৃতীয়বার পূর্ণিয়া ও ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁর কারাজীবন অতিবাহিত হয়। ১৯৪১ সালে তিনি পূর্ণিয়া জেলা-কংগ্রেসের সম্পাদক হন। ১৯৪২-এর আন্দোলনে পূর্ণিয়ার জেলা-সংগঠনের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকার সময় (১৯৪৩-৪৪) তিনি রচনা করেন 'জাগরী' উপন্যাস। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৪৫ সালে তিনি পুনরায় কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে কিষাণগঞ্জে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের মূল সংগঠক ছিলেন সতীনাথ। ১৯৪৮ সালে তিনি সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই রাজনীতি থেকে সরে আসেন। তাঁর দৃষ্টিতে, কংগ্রেস আদর্শভ্রষ্ট একটি দল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সুবিধেবাদী মানুষেরা কংগ্রেসে ভিড় করেছে। শুধু কংগ্রেস নয় সোস্যালিস্ট দলেও এই বেনোজল প্রবেশ করেছিল। এই প্রসঙ্গে ফণীশ্বর নাথ রেণু লিখেছেন ঃ

"জেলার সেরা জমিদারের ছেলেরা পার্টিতে ঢুকেছিল। ওরা চাইত না যে পার্টিতে কোন এরকম ব্যক্তি আসুক, যে সাধারণ কিষাণ মজুরদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত করে। ভাদুড়ীজীর পার্টি ত্যাগের জন্য স্থানীয় জমিদার-পুত্ররা আনন্দিত হয়েছিলেন।"

রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে সতীনাথ পূর্ণিয়ার বাসভবনে ফিরে আসেন। জীবনে বাকি সময় তিনি ভাষাশিক্ষা, উদ্যানচর্চা, সাহিত্যচর্চা ও বিদেশভ্রমণে অতিবাহিত করেছেন। ১৯৫০ সালে প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয় তাঁর 'জাগরী' উপন্যাসটি। ফ্রান্সে থাকার সময় দাদার টেলিগ্রামের মাধ্যমে এই সুখবর পেয়েছিলেন সতীনাথ। প্রথম পুরস্কারে ভূষিত হলেও 'জাগরী' প্রকাশ করতে কলকাতার প্রকাশকেরা আগ্রহ প্রকাশ করেননি। আর তাই,

প্রাক্তন বিপ্লবীদের দ্বারা পরিচালিত সমবায় প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় উপন্যাসটি। প্রকাশক ছিলেন মহাদেব সরকার। প্রকাশকাল ১৯৪৫ সালের অক্টোবর। উপন্যাসটি অতি দ্রুত পাঠকমহলে সমাদৃত হয়। সতীনাথের উপন্যাস সংখ্যা ছয়টি, গল্প একশটি, প্রবন্ধ ও রম্যরচনা দশটি, কবিতা চারটি এবং নাটক একটি। এছাড়া রয়েছে অগ্রন্থিত কিছু গল্প ও প্রবন্ধ। মাত্র ৫৯ বছর বয়সে ১৯৬৫ সালের ৩০ মার্চ সতীনাথের মৃত্যু হয়। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে পূর্ণিয়ার নিকটবর্তী 'সৌরা' নদীর ধারে 'ক্যাপটেন' ব্রীজের কাছে শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। আমৃত্য অকৃতদার সতীনাথ মৃত্যুর মুহূর্তে ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। 'জাগরী' ও তার পরবর্তী সাহিত্য সৃষ্টির একটি তালিকা এখানে তুলে ধরা যেতে পারে ঃ

টিপ্পনী

গ্রন্থনাম	পরিচয়	প্রকাশকাল
জাগরী	উপন্যাস	১৯৪৫
গণনায়ক	ছোটগল্প সংকলন	১৯৪৮
জাগরী	কিশোর সংস্করণ	১৯৪৮
জাগরী	হিন্দি সংস্করণ	১৯৪৮
অপরিচিতা	গল্প সংকলন	১৯৫০
চিত্রগুপ্তের ফাইল	উপন্যাস	১৯৫১
ঢোঁড়াই চরিতমানস (প্রথম চরণ)	উপন্যাস	১৯৫১
ওই (দ্বিতীয় চরণ)	ওই	১৯৫১
সত্যি ভ্রমণ কাহিনী	ভ্রমণ কাহিনি	১৯৫১
অচিন রাগিণী	উপন্যাস	১৯৫৪
চকাচকী	গল্প সংকলন	১৯৫৬
সংকট	উপন্যাস	১৯৫৭
পত্রলেখার বাবা	গল্প সংকলন	১৯৫৯
জলভ্রমি	গল্প সংকলন	১৯৬২
ভিজিল (Vigil)	জাগরীর ইংরেজি সংস্করণ	১৯৬২
অলোক দৃষ্টি	গল্প সংকলন	১৯৬৪
সতীনাথ বিচিত্রা	বিচিত্র রচনা	১৯৬৫
দিগভ্রান্ত	উপন্যাস	১৯৬৬
ঢোঁড়াই চরিতমানস	হিন্দি অনুবাদ	১৯৭৪

◻ 'জাগরী' উপন্যাসের পটভূমি

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন তৈরি হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়লাভ ও মন্ত্রীসভা গঠন ইংরেজ সরকারকে বিচলিত করে দেয়। ক্ষমতা হাতছাড়া হবার আশঙ্কায় তারা ভারত-শাসন আইন সংশোধন করে এবং প্রাদেশিক শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে বড়লাটের হাতে জরুরি ক্ষমতা প্রদান করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা হবার পর ভারত-রক্ষা অর্ডিন্যান্স জারি করে ভারতীয়দের ব্যক্তি-স্বাধীনতার কণ্ঠ রোধ করা হয়। কংগ্রেসের ছোটো বড়ো সব নেতাকে গ্রেপ্তার করে কংগ্রেসের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটিশ সরকার। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এই দমন নীতিকে উৎসাহ দেন। এই সময়ে ভারতের বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ভারতের জাতীয় স্তরের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে ভারতীয় জনগণের পক্ষে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে। নীতিগত ভাবে তাঁরা ফ্যাসীবাদের বিরোধী ছিলেন। আর তাই ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির বিরুদ্ধে তাঁরা ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করার বিনিময়ে কিছু প্রতিশ্রুতি চাইল –

(ক) যুদ্ধের পর সংবিধান-সভা আহ্বান করা হবে।

(খ) সেই সভায় স্বাধীন ভারতের সংবিধান গঠিত হবে।

(গ) বর্তমান অবস্থায় কেন্দ্রে কংগ্রেসের সহযোগিতায় একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা হবে।

কিন্তু বড়লাট এই প্রস্তাবগুলি সরাসরি না মেনে ৮ আগস্ট ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে জানান, ভবিষ্যতে কোনো এক সময় ভারতকে 'জেমিনিয়ন স্টেটাস' দেওয়া হবে, সংবিধান সভাও আহ্বান করা হবে, কিন্তু সেই সংবিধান ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন অনুসারে কার্যকর করা হবে – গণভোটের ভিত্তিতে নয়। স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। গান্ধীজির নির্দেশে বিনোবা ভাবে, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ বহু নেতা ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। প্রায় ২০ হাজার কংগ্রেস কর্মী ১৯৪০-৪১ সালে কারারুদ্ধ হন। সতীনাথ ভাদুড়ীও সেই সময় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগদান করে এক বছরের জন্য হাজারিবাগ জেলে বন্দী-জীবনযাপন করেন। ১৯৪১ সালে তিনি পুণরায় ছ'মাসের জন্য পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেলে অবস্থান করেন।

১৯৪১ সালের শেষ দিকে সত্যাগ্রহের আবেগ ও আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে। মহাত্মা গান্ধী যুদ্ধরত ব্রিটিশ সরকারকে অতিরিক্ত রাজনৈতিক চাপ দেওয়াকে নীতিবিরুদ্ধ বলে মনে করেন। কিন্তু সুভাষ চন্দ্র বসু এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন নি। এদিকে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি প্রথমে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করলেও নাৎসী-সোভিয়েত চুক্তির পর সিদ্ধান্ত বদল করে। কম্যুনিস্টদের ব্রিটিশ-তোষণ নীতি অনেকেই মেনে নিতে পারেন নি। 'জাগরী' উপন্যাসে কম্যুনিস্ট নীলুর স্বগত-কথন থেকে জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের সেই তীব্র ঘৃণার একটি দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

"জনতার দিকে তাকাইতে পারিতেছি না কিন্তু অনুযোগ ও ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি অনুভব করিতেছি। ...'জু'-তে বন্যজন্তুকে যে দৃষ্টিতে দেখে, সেদিন জেল ওয়ার্ডাররা সেই দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়াছে, ...ঐ মোকদ্দমায় দাদার সহিত আর দুইজন আসামী ছিল, –সুরজদেও আর

টিপ্পনী

হরিশচন্দর। আমি এজাহার দিতে উঠিলে হরিশচন্দর চীৎকার করিয়া আসামীর কাঠগড়া হইতে বলিয়া উঠিয়াছিল - 'ছি! ছি! ছি! ছি!' ....ওয়ার্ডার ও পুলিশে আসামীর কাঠগড়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। হরিশচন্দর তাহার মধ্য হইতেই আমাকে তীব্র স্বরে বলিল 'কুত্তা কাঁহাকা'।"

যুদ্ধে জাপানের আধিপত্য বিস্তার ব্রিটিশ সরকারকে চিন্তায় ফেলে দেয়। সরকার উপলব্ধি করে ভারতবাসীর সাহায্য ছাড়া এদেশে ব্রিটিশ শাসন অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে না এবং জাপানকেও প্রতিরোধ করা যাবে না। আর তাই, মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট, চীনের রাষ্ট্রপতি চিয়াং-কাই শেখ এবং ইংল্যান্ডের শ্রমিক দলের মন্ত্রীদের পরামর্শে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ভারতীয়দের কিছু ইতিবাচক প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শ্রমিক-দলের সদস্য স্যার স্ট্র্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌কে কিছু ইতিবাচক প্রস্তাবসহ ভারতে প্রেরণ করা হয়। ক্রীপ্‌স্‌-এর প্রস্তাবে এমন কিছুই ছিল না যা কংগ্রেসকে খুশী করতে পারে। শেষ পর্যন্ত ক্রীপ্‌স্‌ প্রস্তব ভেস্তে যায়। ১৯৪২ সালের ১১ এপ্রিল কংগ্রেস 'ক্রীপ্‌স্‌ প্রস্তাব' প্রত্যাখ্যান করে। গান্ধীজীর ভাষায় এই প্রস্তাব ছিল 'A post dated cheque on a crashing bank.'

গান্ধীজী বললেন, ভারতের সঙ্গে জাপানের কোনো শত্রুতা নেই। ব্রিটিশ ভারতে আছে বলেই জাপান এই দেশকে আক্রমণ করছে। তাই ব্রিটিশের অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করে চলে যাওয়া উচিত। সুভাষচন্দ্র বসু তখন ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে জাপানি সৈনিকদের সাহায্যে 'দিল্লি চলো'র ডাক দিয়েছেন। সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলও মনে করেছিলেন, স্বাধীনতার এটাই উপযুক্ত সময়। গান্ধীজী প্রখ্যাত মার্কিন লেখক ও সাংবাদিক লুই ফিশারকে বলেন, 'আমি ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করি না। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও ফ্যাসিবাদের সমগোত্রীয়।'

মুম্বই শহরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ঐতিহাসিক অধিবেশনে ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট 'ভারত ছাড়ো' তথা 'আগস্ট প্রস্তাব' গৃহীত হয়। গান্ধীজী 'Do or Die'-এই আহ্বানের মাধ্যমে সুদৃঢ় ভাষায় জানালেন, যে কোনো মূল্যে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করতে চান। আতঙ্কিত বড়লাট গান্ধীজীর এই আন্দোলনকে বিধ্বস্ত করার জন্য সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ১৯৪২-এর ৯ আগস্ট ভোরবেলা মুম্বই শহরে সমবেত ছোটো বড়ো সমস্ত কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করে। অন্যায়ভাবে দেশনেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে দেশের মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অহিংস আন্দোলন হিংসার রূপ নেয়। সবাই নিজের হাতে আইন তুলে নেয়। আসমুদ্র হিমাচল সেই সময় জেগে ওঠে। সতীনাথ 'জাগরী' উপন্যাসে ভারতবাসীর এই রাজনৈতিক মহাজাগরণের কাহিনিই শিল্পরূপ দান করেছেন। 'জাগরী' উপন্যাসে এই গণ বিদ্রোহের পরিচয় পাওয়া যায় কম্যুনিস্ট নীলুর স্বগত-কথনে ঃ

"এক বৈদ্যুতিক শক্তি সহসা দেশসুদ্ধ লোককে উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশেহারা করিয়া দিয়াছে। যেখানে যাও মনে হইতেছে যেন পাগলা গারদের ফটক খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিক্ষুব্ধ অথচ নেশাগ্রস্ত জনতা কী করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। মাইলের পর মাইল রেললাইন তুলিয়া ফেলিয়াছে - লোহার রেললাইন, ভারী ভারী রেলওয়ে স্লিপার, আরও কত জিনিস, দূরের নদীতে গিয়া ফেলিয়া আসিতেছে। টেলিগ্রাফের তার কাটা পোস্ট অফিস ও মদের দোকান জ্বালানোর ভার গ্রামের বালকদের উপর।...চৌকিদার তাহার উর্দি জ্বালাইয়া কাজে ইস্তফা দেয়। গরীব কিষাণদের আনন্দ, আর তাহাকে জমিদারের খাজনা দিতে হইবে না।... জেল খুলিয়া কয়েদী পালাইতেছে। জেলখানার উপর কংগ্রেস পতাকা। সরকারী ট্রেজারির নোটগুলি জ্বালানো হইতেছে। পশ্চিমে

টিপ্পনী

গোরখপুর জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে পূর্ণিয়া পর্যন্ত সর্বত্রই দেশের এই অবস্থা। সম্পূর্ণ অরাজকতা–ফ্যাসিস্টদের রাজত্ব–জাতীয় শক্তির বিরাট অপচয়–অসংহত, বিশৃঙ্খল, অদূরদর্শী –অথচ দুর্লভ নিঃস্বার্থ ত্যাগের মহিমায় মহীয়ান।"

এই সময় পূর্ণিয়া জেলা–সংগঠকের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সতীনাথের উপর। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ তাঁকেও গ্রেপ্তার করেছে। গান্ধীবাদী হলেও সোস্যালিস্ট পার্টির প্রতি তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। সেই সমর্থন আমরা 'জাগরী' উপন্যাসের বিলুর মধ্যেও দেখতে পাই। এই প্রসঙ্গে ড. বীরেন ভট্টাচার্যের বক্তব্য উপস্থাপন করা যেতে পারে। সতীনাথ সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেনঃ

টিপ্পনী

"কংগ্রেসে থাকাকালীন তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণ, গঙ্গাশরণ সিং এবং বিহারের আরও সোস্যালিস্ট কর্মীদের সংস্পর্শে আসেন, এবং তিনি তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে মনস্থির করেন। ১৯৪২ আন্দোলনের পূর্ণিয়া জেলা–সংগঠনের ভার সতীনাথের উপর ন্যস্ত ছিল গোপনে। বিপুল অর্থের হিসাব, রিভলবার আনা–নেওয়া ও সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজ সতীনাথ ও আমরা কয়েকজন মিলে করি। সতীনাথ ধরা পড়লেন। আমার নামে বেরোল ওয়ারেন্ট।"

সেই সময়ে পূর্ণিয়া জেলে বন্দী হন সতীনাথ। কারাগারে আইন অমান্য ও কর্মবিরতি পালনের জন্য পুলিশ তাঁর উপরে লাঠি চার্জ করে। কারাগারের অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে তিনি জেল ভেঙে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এরপর তাঁকে পূর্ণিয়া থেকে ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯৪২–এর 'আগস্ট আন্দোলন' ছিল স্বতঃস্ফূর্ত একটি গণ আন্দোলন। কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই ভারতের প্রায় সর্বত্র এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলন যদিও সফলকাম হয় নি। তবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই আন্দোলনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ব্রিটিশ শক্তির ভিত্তি তখন থেকেই দুর্লভ হয়ে পড়েছিল। সতীনাথের 'জাগরী' এই অগ্নিগর্ভ কালবেলার পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস। সেই অগ্নিগর্ভ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল যাঁরা সেই অজ্ঞাত ও অখ্যাত জনগণের উদ্দেশেই 'জাগরী' উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন সতীনাথঃ

> "যে সকল অখ্যাতনামা রাজনৈতিক কর্মীর কর্মনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের বিবরণ, জাতীয় ইতিহাসে কোনোদিনই লিখিত হইবে না, তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশে।"

□ 'জাগরী' ঃ রাজনৈতিক উপন্যাস

রাজনীতি বিষয় নিয়ে লেখা যে সব উপন্যাস – সেগুলোই সাধারণভাবে 'রাজনৈতিক উপন্যাস' আখ্যা পেয়ে থাকে। কিন্তু এত সরল ভাবে কোনো উপন্যাসকে 'রাজনৈতিক উপন্যাসের' তকম দেওয়া উচিত নয়। রাজনৈতিক উপন্যাসে দেশের একটি প্রাণময় উত্তেজনার রূপরেখা থাকে, এমন একটি সার্বজনীন ভাবাবেগ ধরা থাকে – যার উত্তাপ আপাতভাবে শেষ হয়েছে মনে হলেও ঐতিহাসিক চেতনায় তা সজীব থাকে। শুধু রাজনৈতিক মতবাদ বিতরণের জন্য যে সব কাহিনি বলা হয়ে থাকে, তাকে রাজনৈতিক রচনা বলা যেতে পারে – 'রাজনৈতিক উপন্যাস' কখনোই নয়। বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস হলো ঃ

মনোজ বসুর 'উনিশ শো বেয়াল্লিশ', সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি', শরৎচন্দ্রের 'পথের

দাবী', গোপাল হালদারের 'একদা', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লালমাটি', 'মন্দ্রমুখর', 'স্বর্ণসীতা' প্রভৃতি।

প্রকৃত রাজনৈতিক উপন্যাসের লক্ষণ সম্পর্কে সমালোচকবৃন্দ ঐক্যমতে উপনীত হতে পারেন নি। আর তাই, সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'কে কেন্দ্র করেও মতান্তর ও মনান্তরের শেষ নেই। কারো মতে, 'জাগরী রাজনৈতিক উপন্যাস, কিন্তু নিছক রাজনীতি সর্বস্ব উপন্যাস নয়।' কেউ বলেছেন, 'জাগরী মনস্তাত্ত্বিক রাজনৈতিক উপন্যাস', কারো বক্তব্য, 'জাগরী উপন্যাস মানবিক মর্যাদার উপন্যাস', আবার কারো মতে, 'জাগরী উপন্যাসটি রাজনীতি-সম্পৃক্ত চারজন মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কাহিনি'। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে ঃ

টিপ্পনী

"রাজনৈতিক পটভূমিতে লেখক যেটা ধরতে চেয়েছেন, সেটা জীবনের অন্তরালবর্তী শাশ্বত সত্তা। পারিবারিক ভাবতরঙ্গকে রাজনৈতিক ঝড় আবর্ত সঙ্কুল করে তুলেছে - তারই চিত্র আঁকতে গিয়ে লেখক আসলে ফুটিয়ে তুলেছেন পারিবারিক জীবন-রস। প্রকৃত রাজনৈতিক উপন্যাসে রাজনৈতিক বাতাবরণ একটা আধার-আসল আধেয় হল জীবন রস।....জাগরী, সেই সুপরিণত জীবনরস বোধেয় সাক্ষ্য দেয়।"

সুতরাং সমালোচকদের প্রজ্ঞা ও বোধ অনুসারে তাঁরা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে পারেন। রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে 'জাগরী' কতটা সার্থক তা বিচার করার পূর্বে কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি নজর দেবার প্রয়োজন রয়েছে ঃ

ক) লেখক স্বয়ং ব্যক্তিজীবনে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

খ) উপন্যাসের চারটি মূল চরিত্রই কোনো না কোনো রাজনৈতিক মতবাদ ও আদর্শে বিশ্বাসী।

গ) উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ১৯৪২ সালের আন্দোলন ও বিপ্লবমুখর ভারতবর্ষ।

ঘ) চারটি চরিত্রই রাজনৈতিক বন্দী।

ঙ) চরিত্রগুলির স্বগত-ভাবনার অনেকখানি অধিকার করে আছে পরাধীন দেশ, দেশের সংগ্রামী মানুষ, নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাসের বিশ্লেষণ ও অপর চরিত্রগুলির রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতি সমালোচনার মনোভাব।

চ) চারটি চরিত্রই এক বা একাধিকবার রাজনৈতিক কারণে কারাবরণ করেছে।

ছ) চরিত্রগুলি শুধু রাজনৈতিক সত্তায় পর্যবসিত হয় নি - তারা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষ।

জ) জীবনের সঙ্কটময় সময়ের সম্মুখীন হয়ে প্রত্যেকটি চরিত্রই রাজনৈতিক বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চেয়েছে।

ঝ) নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাসকে গোপন না করেও লেখক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ও মতবাদের এক একপট ও বিশ্বাসযোগ্য রূপরেখা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। পাঠককে কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত করা তাঁর অভিপ্রায় ছিল না।

ঞ) 'জাগরী'-র উৎসর্গ পত্রে লেখা হয়েছে ঃ 'যে সকল অখ্যাতনামা রাজনৈতিক কর্মীর

কর্মনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের বিবরণ, জাতীয় ইতিহাসে, কোনোদিনই লিখিত হইবে না, তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশে'।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি থেকে একথা স্পষ্ট যে রাজনৈতিক অনুষঙ্গ উপন্যাসটি'র সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে যুক্ত রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'জাগরী' গতানুগতিক রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে নি - শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক বিশ্বাস ও সংঘাত জয়ী হয় নি। চরিত্রগুলির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের তুলনায় বড়ো হয়ে উঠেছে পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ এই মানুষগুলির টানাপোড়েন, যন্ত্রণা, মনস্তাপ। তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে ফিরে আসতে চেয়েছে মানবিক চাহিদার স্বাভাবিক ও অনিবার্য কারণে।

টিপ্পনী

বিলুর আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে গান্ধীবাদী বাবার রাজনৈতিক পরিচয়ের থেকে বড়ো হয়ে উঠেছে মানবিক পরিচয়। একজন পিতার মর্ম-যন্ত্রণা ও মানসিক সন্তাপ তাকে দগ্ধ করেছে প্রতিনিয়ত।বাবার কিছু স্বগত-ভাবনার উল্লেখের মধ্য দিয়ে দেখানো যেতে পারে তার যন্ত্রণাকাতর পিতৃহৃদয়ের ছবি ঃ

ক) নেপালে শুনিয়াছি, একজনের বদলে আর একজন রাজদণ্ড ভোগ করিতে পারে। ...এখানে যদি এমন একটি নিয়ম থাকিত, যাহাতে বিলুর বদলে আমার গেলেও তো।

খ) কত গল্প শুনিয়াছি যে, একজন আর একজনের রোগ নিজের উপর লইয়াছে! হুমায়ুনের মৃত্যুশয্যায় বাবর এই রূপ করিয়াছিলেন।

গ) চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছে। ...মহাত্মাজী, আমার মনে বল দাও। সংযমের বাঁধ আর বুঝি থাকে না। আর তো নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিতেছি না।

ঘ) মনে ইচ্ছা হয়, বিলু জানুক, যে তাহারই কথা মনে করিয়া, এইবার জেলে ফলমূল দুধ এ সকল জিনিস খাই না, মশারি ফেলিয়া শুই না। হয়তো, বিলু এ খবর জানিতে পারিলে, তাহার মনে একটু তৃপ্তি হইত। তাহার বাবা যে তাহার জন্য একটুও ভাবে একথা সে বুঝিতে পারিত।

ঙ) আজ রাত্রিটা অন্তত যদি বিলুর কাছে থাকিতে পারিতাম না, এক সঙ্গে না থাকায় ভালোই হইয়াছে। তাহা হইলে হয়তো দুজনেই ভাঙ্গিয়া পড়িতাম - তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কথা তো বলিয়া লইতে পারিতাম।

একইভাবে বিলু ফিরে আসতে চেয়েছে পরিবারের কাছে।নীলু ফিরে পেতে চেয়েছে হারিয়ে যাওয়া শৈশবের সোনালি দিনগুলি। মা চেয়েছেন তাঁর পুরনো পারিবারিক স্নেহ মমতায় ভরা জীবন।

'জাগরী' উপন্যাসের সত্তর থেকে আশি শতাংশ জুড়ে আছে চরিত্রগুলির অরাজনৈতিক ভাবনা-প্রবাহ, ব্যক্তিগত অনুভূতি, পারিবারিক স্মৃতি, আত্মীয়-পরিজনদের কথা। মাত্র কুড়ি থেকে তিরিশ শতাংশ আছে দেশ-কাল-রাজনীতির অনুষঙ্গ। যদিও এই রাজনীতির অনুষঙ্গই চরিত্রগুলিকে আন্দোলিত করেছে। ফাঁসি সেলে বিলুর ভাবনার বিস্তার ৫৭ পৃষ্ঠা। তার স্বগত-ভাবনার শুরুতে রয়েছে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতা।এরপর বিচ্ছিন্নভাবে এসেছে

নীলুর কথা, মায়ের কথা, বাবার কথা, সরস্বতীর কথা, বিভিন্ন সময়ের রাজবন্দীদের কথা, কাশীর বিদ্যাপীঠের ছাত্রজীবনের কথা, জেলের ওয়ার্ডার ও কয়েদীদের কথা, নবদ্বীপ থেকে বৃন্দাবন-যাত্রী মাসিমার কথা, নিজের আসন্ন মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নানা কল্পনা। তারই মাঝে কখনো কখনো এসেছে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ।

আপার ডিভিসন থেকে বাবার ভাবনার বিস্তার ৪৫ পৃষ্ঠা জুড়ে। এখানেও প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তিগত শোক, অতীতের পারিবারিক স্মৃতি, স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে তাঁর ব্যবধানের প্রসঙ্গ। এসবের মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে এসেছে রাজনৈতিক সংঘাতের কথা - যা তুলনামূলকভাবে খুবই কম।

টিপ্পনী

আওরৎ কিতা থেকে মায়ের ভাবনা-সূত্র ৪১ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ। এখানেও রাজনীতির তুলনায় অন্যান্য পারিবারিক স্মৃতিচারণাই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। স্বামীর প্রতি, গান্ধীজীর প্রতি তাঁর ভর্ৎসনা একজন মায়ের যন্ত্রণাকাতর হৃদয়কেই উন্মোচিত করেছে। মায়ের জীবনে রাজনীতি একটা অভিশাপ। গান্ধীবাদী স্বামী তাঁর সহধর্মীনীকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন - "রাজনীতির বন্ধুর ক্ষেত্রে সে ইচ্ছা করিয়া বাছিয়া লয় নাই। বানভাসির মতো ভাসিয়া আসিয়াছে মাত্র। তাহার স্বাভাবিক ক্ষেত্র একটি ঘরকন্নার সংসার, নিবিড় সুখে ভরা, অতি দরদের সহিত নিজহাতে গড়িয়া তোলা। ....সেখান হইতে একরকম জোর করিয়াই আমি উহাকে লক্ষ্যের কন্টকময় পথে লইয়া আসিয়াছি।" আপাদমস্তক একজন অতি সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহকর্ত্রী অরাজনৈতিক একটি মানুষ হয়ে উঠেছে উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

জেলগেটে প্রতীক্ষারত বিনিদ্র নীলুর উদ্বেগ ধরা হয়েছে ৪৭ পৃষ্ঠা জুড়ে। কংগ্রেস থেকে কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট, সেখান থেকে চন্দ্রদেও-র প্রভাবে রাতারাতি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান নীলুর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেয় না। আসলে রাজনৈতিক গভীরতা তার কোনো কালেই ছিল না। রাজনীতির ক্ষেত্রে চিরকাল সে দাদার বশীভূত হয়ে থাকতে চায় নি বলে দল ছেড়েছে। অথচ কম্যুনিস্ট দলে গিয়েও সে চন্দ্রদেও-র নির্দেশেই কাজ করেছে। দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রেও সে পার্টির স্থানীয় শাখার সদস্যদের নিষেধকে অমান্য করেছে। নীলুর রাজনৈতিক চেতনা মায়ের মতোই অগভীর। নীলুর স্বগত-ভাবনাতেও রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে অতীতের স্মৃতি, শৈশব-কৈশোরের নস্টালজিয়া, দাদার সঙ্গে অতিবাহিত দিনের কথা, মায়ের সঙ্গে কাটানো শৈশবের দুরন্তপনার দিনগুলি।

এভাবেই রাজনীতির বিভীষিকাকে অতিক্রম করে বড়ো হয়ে উঠেছে মানবিক প্রেম ও সম্পর্কে সূক্ষ্ম টানাপোড়েন। সতীনাথ 'জাগরী' উপন্যাসে কোনো রাজনৈতিক মতকে শেষ পর্যন্ত সমর্থন জানান নি। ড. তরুণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন ঃ

"জাগরী উপন্যাসে দলীয় চরিত্রগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক পথ ও মতকে তুচ্ছ করে এমনিভাবেই পিছলে বেরিয়ে গেছে সেই মানবিক মান অভিমান স্নেহ ও ধৈর্যের অতল সমুদ্রে। ...তিনটি দল সেখানে শাসনযন্ত্র অধিকারের লড়াই করতে গিয়ে নিজের যুক্তি ও আদর্শের পথে এগোতে গিয়ে বুঝে গেছে মানুষের অধিকার লাভের পথ দুর্বলতা ও সংকীর্ণতায় কী ক্ষত বিক্ষত, রক্তের টান কী মারাত্মক।"

অতএব, এই উপন্যাসে রাজনৈতিক উপন্যাসের নানা উপাদান থাকা সত্ত্বেও লেখক সেই উপাদানকে ব্যবহার করেছেন মানুষের মানবিক সম্পর্কের দোলাচলের শিল্প রচনায়। লেখক উপন্যাসটিকে ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় পাঠ করতে নির্দেশ দিলেও এর

মধ্যে এমন এক সর্বজনীনতা আছে যা যে কোনো সময়ের পটভূমিকায় সমান আকর্ষণীয়। এখানেই উপন্যাসটি কালজয়ী সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য। রাজনৈতিক মতাদর্শ ও মানবিক জীবনদৃষ্টির মিশ্রণে এটি হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র। শ্রদ্ধেয় অরূপকুমার ভট্টাচার্য সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করেছেন ঃ

"বিতর্কিত রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে সুগভীর জীবনদৃষ্টির এমন সুষম মিশ্রণ সাধারণত কোনো রাজনৈতিক উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় না। লেখক প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও কোনো চরিত্রকে রাজনীতির কোনো বিশেষ মতাদর্শের ভাষ্যকার রূপে চিত্রিত করেন নি।"

টিপ্পনী

–এখানেই গতানুগতিক ধারার অন্যান্য রাজনৈতিক উপন্যাসের থেকে 'জাগরী'র স্বাতন্ত্র্য।

□ জাগরী ঃ কারা উপন্যাস

ইংরেজি 'Prison-Novel' কথাটির অনুসরণে বাংলায় 'কারা-উপন্যাস' নামে এক স্বতন্ত্র শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। লেখক কারাগারে বসে কোনো উপন্যাস রচনা করলেই সেই উপন্যাসকে কারা-উপন্যাস বলা যাবে না। যে উপন্যাসে কারাভ্যন্তরের বন্দীদের কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে – সেই উপন্যাসকেই 'কারা উপন্যাস' বলা যেতে পারে। কারাজীবনের অভিজ্ঞতাকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে 'কারা-উপন্যাসে'। বাংলাভাষায় রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারা উপন্যাস হলো ঃ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাষাণপুরী', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'শৃঙ্খল', জরাসন্ধর 'লৌহকপাট' (তিন পর্ব), 'তামসী' ও 'ন্যায়দণ্ড', প্রফুল্ল রায়ের 'সিন্ধুপারের পাখি', সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' ও 'স্বীকারোক্তি', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'প্রেমের চেয়ে বড়' প্রভৃতি

সমালোচক ড. উত্তম দত্ত কারা উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"যে জাতীয় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যই কারাগার তথা মানুষের কারাবন্দী জীবন, যেখানে কারাবন্দীদের জীবনের ওপরে কারাগারের প্রভাব অমোঘ এবং মর্মভেদী, কারাগার যেখানে সংশ্লিষ্ট চরিত্রদের মানস-সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, কারাগারকে বাদ দিয়ে যে উপন্যাসের অন্তর্গত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অন্তঃশীলা স্রোতকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, প্রকৃতবিচারে তাকেই 'কারা উপন্যাস' বলা যেতে পারে।"

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' রচিত হয়েছিল ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে বসে। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে যোগদানের জন্য পূর্ণিয়া জেলে বন্দী হন সতীনাথ। জেলের ভিতরে আইন অমান্য এবং কর্মবিরতি করার জন্য পুলিশ তাঁর এবং সহবন্দীদের ওপর লাঠি চার্জ করে। সহবন্দীদের সঙ্গে একত্রে জেল ভেঙে পালানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এরপর তাঁর স্থান হয় ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেল। দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জেলের অভ্যন্তরীণ সমস্ত কিছুর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন সতীনাথ। তারই ফশল অসাধারণ শিল্পরূপ 'জাগরী'।

'জাগরী' উপন্যাসের চারটি চরিত্রের দৃষ্টিতে কারাগার কীভাবে প্রতিভাত হয়েছে তা দেখে

নেওয়া যেতে পারে ঃ

বিলুর দৃষ্টিতে কারাগার ঃ

বিলুর দৃষ্টিতে কারাগার এক বিষণ্ণ জগৎ। প্রাণের কথা বলার মানুষ নেই সেখানে। বাইরের আওয়াজ শোনার জন্য সে সর্বদা উৎকীর্ণ হয়ে থাকে। কন্‌ডেমড্ সেলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিলু জানিয়েছে ঃ

"ষোল পা লম্বা, দশ পা চওড়া ঘর। সম্মুখের দিকে মোটা লোহার গরাদের দরজা। দক্ষিণ দেওয়ালে ছাতের কাছাকাছি একটি ছোট গবাক্ষ। তাহারই নীচে, মেঝের সঙ্গে এক হাত চওড়া ও দেড়হাত লম্বা দুইখানি মোটা লোহার পাত দেওয়ালে বসানো। ইহাতে কতকগুলি ছিদ্র আছে। ...ঘরের আসবাবের মধ্যে দুইটি আলকাতরা মাখানো মাটির মালসা এককোণে রাখা রহিয়াছে।"

গরাদের দরজার কাছে বসা থাকে একজন ওয়ার্ডার। সে সারাক্ষণ লক্ষ রাখে বন্দীদের প্রতিটি কার্যকলাপ। সেলের বাইরের গবাক্ষের দিকের পার্শ্ববর্তী চওড়া রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে অসংখ্য কয়েদী, ওয়ার্ডার, ডাক্তার, কম্পাউন্ডার, ঠিকাদার, অফিসার, মিস্ত্রী - আরও নানা লোক। সাড়ে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার মানুষের বসতি-সম্পন্ন শহরকে 'মিউনিসিপ্যালিটি' বলে গণ্য করা হয়। বিলুর চোখে জেলখানাও যেন একটি শহরের মতো। বিলু শৈশব থেকে শুনে এসেছে, মৃত্যুর পূর্বে ফাঁসির আসামীকে প্রশ্ন করা হয় তার শেষ বাসনা সম্পর্কে। জেল-কর্তৃপক্ষ তা সাধ্যমতো পূরণের চেষ্টা করেন। জেল-সুপার বিলুকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোনো জিনিসপত্র প্রয়োজন আছে কিনা? কিন্তু আত্মাভিমানী বিলু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলেছে, 'ধন্যবাদ, আমি বেশ আরামেই আছি।'

বিলু অনুভব করেছে দীর্ঘদিন ধরে চোর-ডাকাত নিয়ে কাজ করতে করতে জেলর, ওয়ার্ডার, জমিদার, ডাক্তার, মেট, দেহরক্ষী প্রমুখ জেলকর্মীদের কোমলবৃত্তিগুলি নষ্ট হয়ে যায়। মানসিক অবসাদ ও আতঙ্কে ফাঁসির আসামীর মধ্যে অনেক সময় আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়। কারাকর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে সচেতন। তাই বিলু লক্ষ করেছে এক নম্বর সেলের ভিতরে কোনো কেরোসিনের লণ্ঠন দেওয়া হয় না, সেটি রাখা হয় বাইরে। বিলু ভাবে ঃ

"আলোটি সেলের ভিতরে দিলে ইহাদের কি ক্ষতি হইত বুঝিতে পারি না। কেরোসিন তেল লাগাইয়া আত্মহত্যা করা খুব আরামের জিনিস নয়। তথাপি ইহারা সাহস পায় না।"

এভাবেই বারম্বার বিলুর স্বগত-কথনের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেল। কারাগারের বিচিত্র ঘটনার পাশাপাশি ফাঁসির আসামী বিলুর অনুভবের মধ্য দিয়ে মানবিক মুগ্ধতাবোধকেও ফুটিয়ে তুলেছেন সতীনাথ ঃ

"জেলের মধ্যে তো একখন্ড জগৎ আছে। জেলের মধ্যে তো শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার পরিবর্তন অনুভব করিতে পারা যায়। আকাশ, বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, তারা সেখানেও মাধুর্য বিলাইতে কার্পণ্য করে না। কালবৈশাখীর মাতলামি, প্রথম বৃষ্টির পর ভিজা মাটির গন্ধ, নিশীথ রাতের বারিধারার মাদকতাভরা রিমিঝিমি, কত স্মৃতিভরা শরতের সোনালী তবকমোড়া রৌদ্র, রহস্যভরা শীতের কুয়াশা, - জেলের প্রাচীরের ভিতরেও ইহাদের নিরঙ্কুশ গতি। তাহার উপর মানুষের মুখ দেখা - হউক তাহারা চোর ডাকাত, তবু মানুষ তো।"

টিপ্পনী

এভাবেই বিলুর দৃষ্টিতে কারাগার মানবিক ও জিবন্ত রূপ লাভ করেছে।

বাবার দৃষ্টিতে কারাগার ঃ

আপার ডিভিসন ওয়ার্ডের সম্মানীয় রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে বাবা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। তাঁর চারপাশে একটা ঘরোয়া বাতাবরণ। একটা প্রকাণ্ড বড়ো হল ঘরে মোট চৌত্রিশ জন বন্দী। উনিশ জন নিরাপত্তা বন্দী ও পনেরো জন কারাবন্দী। তাদের থাকার জন্য রয়েছে সারি সারি চৌকি। তাতে নেটের মশারি টাঙানো। প্রত্যেক তক্তপোশের পাশে একটি টেবিল, একখানি চেয়ার এবং একটি করে বইয়ের শেলফ্। বাবার দৃষ্টিতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়েছে ঃ

টিপ্পনী

"লোহার গরাদ, তালাচাবি, আর ওয়ার্ডারের চেহারা না দেখে গেলে ইহাকে জেল বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই, ঠিক যেন কলেজের ছাত্রদের থাকিবার হস্টেল।"

বাবার দৃষ্টিতে আরো ধরা পড়েছে 'আপার ডিভিসন ওয়ার্ডে'র রাজবন্দীদের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণির কয়েদীদের জীবনযাত্রার মানের প্রভেদ। উচ্চশ্রেণির বন্দীরা সহজেই দই, শরবত, 'গঁদকা লাড্ডু' কিংবা ইচ্ছে হলে আধ-সের আটার রুটি খেতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে 'তৃতীয় শ্রেণির কয়েদীরা একটু গুড়, একটি লঙ্কা বা একটা পেঁয়াজ পাইলে কৃতার্থ হইয়া যায়।' জেলকোড অনুসারে দুবেলা ভাতের নাম 'বেঙ্গল ডায়েট'।

বাবা লক্ষ করেন গান্ধীবাদী কংগ্রেস-কর্মীরা জেলের ভিতর কোনোরকম পঠনপাঠন করেন না। অথচ সোস্যালিস্ট, ফরওয়ার্ডব্লক ও কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা প্রতিদিন নিয়মিত পঠন-পাঠন ও ক্লাস করে। একই কারাগারে দুটি স্বতন্ত্র সেলের বর্ণনা রয়েছে বাবা ও বিলুর স্বগত ভাবনায়। যথাসম্ভব পুনরাবৃত্তি-দোষ পরিহার করে নিপুণ শিল্পীর মতো লেখক কারাগারের অভ্যন্তরীণ বাতাবরণ ও রীতিনীতিকে দুজনের ভিন্ন দৃষ্টিতে মূর্ত করে তুলেছেন।

মায়ের দৃষ্টিতে কারাগার ঃ

মা রয়েছেন মহিলাদের জন্য নির্ধারিত 'আওরত কিতায়'। এখানেও রয়েছে একটা ঘরোয়া পরিবেশ। রামায়ণ পাঠ, মেয়েলি আলাপ-আলোচনা, পরচর্চা ইত্যাদির বর্ণনায় বন্দী-জীবনের কৃচ্ছ্রতার চাইতে বড়ো হয়ে উঠেছে সমবেত মহিলাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও বাদ্-বিতন্ডা। মহিলা-বন্দীদের পারস্পরিক কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কারাগারের নানা রীতি-নীতি ও অভ্যন্তরীণ ছবি ফুটে উঠেছে। যেমন -

ক) কোনো কয়েদী অনশন করে ভাঙতে না চাইলে জেলের ডাক্তার তার শরীরে প্রোটিন ও ক্যালারি 'ইনজেক্ট' করে দেয়। এছাড়া নাকের ভিতর নল প্রবেশ করিয়ে তরল খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

খ) 'আওরৎ কিতা'র নিরাপত্তা ও সম্ভ্রম বিষয়ে জেল-কর্তৃপক্ষ সচেতন। ঘরের তালা ভিতর থেকে বন্ধ করে জমাদারণী দেওয়াল টপকে চাবিটা জমা দেয় 'জেলর সাহেবে'র কাছে। ওয়ার্ডের বাইরের ফটকও চব্বিশ ঘন্টা বন্ধ থাকে।

গ) কোনো বন্দীনী অসুস্থ হলে অথবা মানসিক অবসাদে আক্রান্ত হলে অন্যান্য সহবন্দীরা তার সেবায় এগিয়ে আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

নীলুর দৃষ্টিতে কারাগার ঃ

নীলুর কারাগারের বাইরের যে বর্ণনা দিয়েছে তার সঙ্গে অপর তিনজনের বর্ণিত অভ্যন্তরীণ বর্ণনা মিলে কারাগারটি একটি সম্পূর্ণতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। নালুর স্বগতভাবনার সূচনাতেই রয়েছে 'পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেল'-এর বাহ্যিক পরিকাঠামোর বর্ণনা ঃ

"জেল গেটের সম্মুখের গাড়ি বারান্দার নীচে, ওয়ার্ডার নেহাল সিং-এর সহিত আসিয়া দাঁড়াইলাম। গেটের বাহিরে সশস্ত্র প্রহরী, গেটের ভিতরটি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। ভিতরে আলোর নীচে, সুবাদার সাহেব ডেস্কের পাশে একটি উঁচু টুলের উপর বসিয়া রহিয়াছেন।"

টিপ্পনী

জেলের ভিতরে যারা প্রবেশ করে, অথবা জেল থেকে যারা বাইরে যায় তাদের সতর্কভাবে সার্চ করে সুবাদার সাহেব। তার বেতন বাহান্ন টাকা, কিন্তু উপরি উপার্জন তার চারগুন। নীলুর দৃষ্টিতে জেলখানা বিষাদে ভরা ক্লেদাক্ত জগৎ ঃ

"জেলের সবটাই প্রাচীর নয়। উহার ভিতরেও প্রচুর খালি জায়গা আছে, যেখানে খোলা হাওয়া বাতাস পাওয়া যাইতে পারে। ...কিন্তু তাহা হইলে কী হইবে? ....সারা বাতাবরণ বিষাদে ভরা, প্রাণহীন, কঠোর ও ক্লেদময়। আবহাওয়া কেমন যেন ভারী ভারী।"

ফাঁসির মঞ্চের চারপাশে বড়ো বড়ো আলো জ্বালিয়ে সেই স্থানটিকে দিনের মতো করে রাখা হয়। চারজন ওয়ার্ডার চব্বিশ ঘন্টা সেখানে প্রহরারত। ফাঁসির গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতে উপস্থিত থাকে সুপারিন্টেন্ডে, জেলর, জেল-ডাক্তার, ওয়ার্ডার ও 'স্নিফার ডগ'।

যথাসম্ভব পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা এড়িয়ে সতীনাথ একটি কারাগারকে তার সামগ্রিক রীতি-নীতি-শৃঙ্খলা-ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নির্মম যান্ত্রিকতাকে বিশদভাবে উপস্থাপন করেছেন। সতীনাথের 'জাগরী' উপন্যাসে যে কারা-জীবনের বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে তা বস্তুত পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেল, ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেল এবং হাজারিবাগ জেলের কারা-ব্যবস্থার সম্মিলিত রূপ। নিছক কারা-উপন্যাসের সীমিত গন্ডিতে 'জাগরী' উপন্যাসটিকে আবদ্ধ রাখলে এর মনস্তাত্ত্বিক, চেতনাপ্রবাহমূলক ও রাজনৈতিক দিকগুলিকে কিছুটা গৌণ করা হয়। তবে যথার্থ কারা উপন্যাস (Prison Novel) রচনার একটা আদর্শ ও প্রশস্ত পথ খুলে দিয়েছে সতীনাথের 'জাগরী'।

□ 'জাগরী' ঃ চেতনা প্রবাহরীতির উপন্যাস

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী William James ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম 'Stream of Consciousness' কথাটি ব্যবহার করেন তাঁর 'The Principles of Psychology' গ্রন্থে। বিশ শতকে যখন মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের প্রয়োগ বহুলাংশে ছড়িয়ে পড়ে তখন এই রীতির প্রতি অনেক লেখক আকৃষ্ট হন। সেই আকর্ষণের কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো ঃ

a) In search of Lost Time - By Marcel Proust.

b) Ulysses - By James Joyce.

c) Mrs. Dalloway - By Virginia Woolf.

d) The Sound and the Fury - By William Faulkner.

e) As I Lay Dying - Do

f) One the Road - By Jack Kerouac.

g) Trainspotting - By Irvine Welsh.

h) Last Exit to Brooklyn - By Hubert Selby.

টিপ্পনী

i) None but the Brave - By Arthur Schnitzler.

j) Fear and Loathing in Las Vegas - By Hunter S. Thompson.

চেতনাপ্রবাহরীতিতে এক বা একাধিক চরিত্রের চেতন ও অবচেতন মনের চিন্তন-প্রবাহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও বহুধা-খণ্ডিত হয়ে থাকে। সেইসব খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও আপাত-অসংলগ্ন ভাবনা-প্রবাহের সূত্রগুলি একত্রে সংগ্রহ করে মরমী ও বিচক্ষণ পাঠককেই নির্মাণ করে নিতে হয় মোটামুটি একটি কাহিনির রূপরেখা। এই রীতিতে আনুপূর্বিক সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো ধারাবাহিক কাহিনি বা প্লট থাকে না। বাংলা উপন্যাসে এই রীতির আভাস রয়েছে যে সব রচনায়, সেগুলি হলো - ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহনায়'; গোপাল হালদারের 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন'; জগদীশ গুপ্তের 'রোমন্থন'; সন্তোষ কুমার ঘোষের শেষ 'নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে'; বিমল করের 'অসময়', 'দেওয়াল' প্রভৃতি উপন্যাসে। এই রীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'।

চেতনাপ্রবাহরীতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

ক) "In literary criticism, stream of consciousness denotes a literary technique which seeks to describe an individual's point of view by giving the written equivalent of the character's thought process." (wikipedia, the free encyclopedia)

খ) "In literature, the narrative technique known as stream of consciousness attempts to render the flow of impressions through the awareness of an individual. These impressions-visual, auditory, physical, associative, and subliminal-form part of the person's consciousness along with his national thoughts." (Britanica students encyclopedia)

গ) "A novel that takes as its subject : the flow of the stream of consciousness of one or more of its charecters." (Handbook to Literature, by - W. Harmon & C. Hugh Holman)

চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস হিসেবে 'জাগরী'-র আলোচনা শুরু করার আগে এই রীতির গল্প-উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা যেতে পারে ঃ

ক) চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসে প্রচলিত অর্থে যাকে প্লট বলে তা অনুপস্থিত থাকে।

খ) আনুপূর্বিক কাহিনিসূত্রের পরিবর্তে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় চরিত্রের অন্তঃসংলাপ,

চেতনাপ্রবাহ, চিন্তার খাপছাড়া অনুষঙ্গ, মনের স্বেচ্ছাবিহার, অস্পষ্ট প্রকাশভঙ্গি, অবচেতন মনের বিচিত্র জটিলতাকে।

গ) বাইরের বস্তুরূপকে নয়, বরং এক্ষেত্রে লেখকের লক্ষ্য থাকে 'ইনার রিয়ালিটি' বা অন্তর্বাস্তবকে পরিস্ফুট করা।

ঘ) বাহ্যিক সক্রিয়তার (Doing) চাইতে চরিত্রদের অন্তর্দহন (suffering), বিষাদ, ক্ষোভ, যন্ত্রণা, গোপন অপরাধবোধ বেশি গুরুত্ব পায় এখানে।

ঙ) কৃতকর্ম এবং অপরাধের অকপট স্বীকারোক্তি (confession), গভীর আত্মানুসন্ধান (self-detection), আত্মসমীক্ষা (self-investigation), আত্মবিশ্লেষণ, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নিঃসীম নৈঃসঙ্গ্যের শিকার হয়ে ওঠা এই জাতীয় উপন্যাসের চরিত্র-সমূহের বৈশিষ্ট্য।

চ) মূল প্রসঙ্গ থেকে সহসা প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়া, বারম্বার ভাবনা-সূত্র ছিঁড়ে যাওয়া, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পর্যালোচনায় হঠাৎ তুচ্ছ বিষয়ের অবতারণা, যে কোনো বিষয়ের বস্তুরূপ থেকে অনুপুঙ্খতার দিকে সরে যাওয়া এই শ্রেণির উপন্যাসের কুলক্ষণ।

ছ) এই শ্রেণির উপন্যাসের মর্মে নিহিত থাকে অতি সূক্ষ্ম অস্তিত্ববাদ, অ্যাবসার্ডিজম্, অ্যালিয়েনশন, জজইজম্, প্রিমিটিভিজম্ এবং কখনো ট্র্যানসেনডেন্টালিজম্।

জ) এই জাতীয় উপন্যাসের চরিত্ররা একটা আত্মক্ষয়ী উদ্বেগের শিকার হয়।

ঝ) বর্ণিতব্য বিষয় ও স্বগত-ভাবনার মধ্যে কার্যকারণ-সূত্র প্রায়শই উপেক্ষিত হয় অন্তশ্চৈতন্যের প্রেরণায়।

ঞ) প্রচলিত ধারার উপন্যাসের গতানুগতিক ছক ভেঙে বেরিয়ে আসা এই জাতীয় সৃষ্টিকর্মে তথাকথিত নায়ক-নায়িকার ভাবমূর্তি নির্মাণকে, ক্লাসম্যাক্স সৃষ্টিকে, চরিত্রের ক্রমবিকাশকে কিংবা মর্মভেদী সংলাপ রচনা অগ্রাহ্য করে চরিত্রগুলির মনন, চিন্তন, উদ্ভট খামখেয়ালী আচার-আচরণ ও অনুচ্চারিত এষণাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আর তারই মধ্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে এক একটি নিরাবরণ, নিরাভরণ নগ্ন চরিত্রের স্বরূপ। ছক-ভাঙা এই জাতীয় উপন্যাসকে তাই 'Novel' না বলে 'Anti-Novel' হিসেবে চিহ্নিত করা চলে।

মার্সেল প্রুস্তের উপন্যাস পাঠ করার পর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে সতীনাথ জানিয়েছেন ঃ

"জীবনের আপাত তুচ্ছ ঘটনাগুলো উপর এত গুরুত্ব, তাঁর আগে আর কেউ দেন নি। সেগুলোর সঙ্গেও যে মানুষের মন জড়ানো। আমি মেশানো। ...অনুভূতির মিষ্টি রঙে রাঙাতে পারলে ছাইমাটিও সোনা হয়ে ওঠে।" (পড়ুয়ার নোট থেকে)

এই প্রবণতা চোখে পড়ে জেমস্ জয়েসের 'ইউলিসিস' এবং সতীনাথের 'জাগরী' উপন্যাসে। এখানে কোনো আনুপূর্বিক সূত্র-সমন্বিত 'প্লট' নেই। চারটি চরিত্র রয়েছে একই কারাগারের চারটি পৃথক স্থানে। ফাঁসি সেলে বিলু, আপার ডিভিসন ওয়ার্ডে বাবা, আওরৎকিতায় মা, জেলগেটে প্রতীক্ষারত ছোটো ভাই নীলু। চারজনই পূর্ণিয়াবাসী একটি রাষ্ট্রীয় পরিবারের সদস্য। সময় ১৯৪২ সালের অগিন্মুখর ভারতবর্ষ। প্রেক্ষাপট ঃ বিধ্বংসী আগস্ট আন্দোলন। সোস্যালিস্ট

টিপ্পনী

বিলু এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের অভিযোগে সামরিক ট্রাইব্যুনালের বিচারে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত। সে বিনিদ্র প্রহর যাপন করছে এক নম্বর সেলে। কাল ভোরেই তার ফাঁসি হতে চলেছে। তার বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছে তারই অনুজ নীলু। সে কম্যুনিস্ট। তার দৃষ্টিতে সোস্যালিস্টদের এই তান্ডব দেশদ্রোহিতার নামান্তর। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতিপত্র নিয়ে সে অপেক্ষা করে আছে কারাগারের দরজায় ভোরবেলা দাদার মৃতদেহ সৎকারের জন্য নিয়ে যাবে বলে। উদ্বেগ, অপরাধবোধ আর বিবেকদংশন বুকে নিয়ে সেও অতন্দ্রপ্রহর যাপন করছে।

টিপ্পনী

'বাবা' একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী। গান্ধীজী তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। প্রিয় পুত্রের আসন্ন মৃত্যুর চিন্তায় এবং আত্মবিশ্লেষণের দহন তাঁকেও জাগিয়ে রেখেছে সারারাত। উদ্বেগে আর অস্থিরতায় তাঁর চরকার সুতো ছিঁড়ে যায়। 'মা' আন্তরিকভাবে না হলেও স্বামীর সিদ্ধান্তকে বেদবাক্য মনে করে এবং স্বামী ও সন্তানদের সান্নিধ্যে বসবাস করার স্বাভাবিক প্রলোভনে গান্ধীজীর স্পর্শধন্য আশ্রমে বাস করেছেন। এই মুহূর্তে তিনিও গান্ধীবাদী হিসেবে বন্দী হয়ে আছেন একই কারাগারের মহিলাদের জন্য নির্ধারিত কক্ষে। বড়ো ছেলের আসন্ন মৃত্যুর পূর্বরাত্রে তিনিও অনিবার্য উদ্বেগ ও মর্ম যন্ত্রণায় ঘুমোতে পারছেন না।

চারটি চরিত্র যেন চারটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। গোধূলী থেকে প্রভাত পর্যন্ত উপন্যাসের কালগত বিস্তার। এই অসহ্য কালরাত্রিতে চারটি চরিত্রের চেতনায় একই সময়ে ভেসে আসছে অতীতের অসংখ্য ছোটোবড়ো তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা। বর্তমানের বাস্তব অভিঘাতে মাঝে মাঝেই তাদের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় তারা নিমজ্জিত হয়েছে স্মৃতির সাগরে। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের প্রত্যেকের ভাবনা-তরঙ্গের মধ্যে রয়েছে নানা অসংলগ্নতা, তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি অকারণ আলোকপাত, ফেলে আসা জীবনকে নতুন করে বিশ্লেষণের চেষ্টা। এক হিসেবে 'জাগরী'র বাব, মা, বিলু, নীলু চারজনই নির্বাসিত ও নিঃসঙ্গ চরিত্র। প্রবল আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও তারা পুনরায় তাদের পারিবারিক জীবনের সোনালি আবেষ্টনীর মধ্যে ফিরে যেতে পারছে না। তাই বিষাদে বিক্ষোভে, আত্মগ্লানিতে, হতাশায় তারা ভেবেছে এমন কিছু ভাবনা যা আগে কখনো ভাবেনি এভাবে। নিজের অথবা একটি প্রিয় স্বজনের আসন্ন মৃত্যুর অনিবার্যতাকে সামনে রেখে তারা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকে নতুন এক দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করেছে একান্ত নিঃসঙ্গতার চূড়ায় দাঁড়িয়ে।

আমরা যা ভাবি তার সবটা কখনো অন্যের কাছে ব্যক্ত করি না, করা যায় না। আমরা যা করি এবং বলি তার মধ্যে অনেকসময় আমাদের মনের পরিপূর্ণ সমর্থন থাকে না। অথচ সেই কৃতকর্ম ও বলে ফেলা বাক্যের নিরিখেই মানুষ আমাদের বিচার করে। আমরা যা বলতে চাই, বোঝাতে চাই তার সবটা কিছুতেই বলা বা বোঝানো যায় না। অথচ সেই অনুচ্চারিত বাক্য ও মনোভাবের মধ্যেও রয়ে যায় আমাদের গহন সত্তার স্বরূপ। এই যন্ত্রণা নিয়েই আধুনিক মানুষ বেঁচে থাকে। সতীনাথ উন্মোচিত করতে চেয়েছেন সেই গহন সত্তার অনুচ্চারিত যন্ত্রনাময় সত্যকে। একমাত্র চেতনাপ্রবাহরীতির আশ্রয়েই তা সম্ভব বলে 'জাগরী' উপন্যাসে তিনি এই রীতিকে বেছে নিয়েছেন। চারটি চরিত্রের ভাবনাসূত্রেই পাঠক অনুভব করেন মানব জীবনের অন্তরালবর্তী অন্য এক রূপ, ভিন্ন এক রহস্য।

সতীনাথ গতানুগতিক উপন্যাসের বর্ণনারীতিকে সচেতন ভাবে এড়িয়ে গিয়ে পাঠককে আহ্বান জানিয়েছেন জীবনের আপাত-এলোমেলো চৈতন্য-স্রোতের গহন লোকে। চরিত্রের

'Doing'-এর চাইতে তাদের 'Suffering'-কে, অচরিতার্থতাবোধের যন্ত্রণা ও অপরাধবোধকে, স্বীকারোক্তি ও আত্মানুসন্ধানকে অধিকতর মূল্য দিয়েছেন। 'সিরিয়াস' ভাবনার মাঝখানে সহসা এসেছে তুচ্ছ ও অপ্রাসঙ্গিক ভাবনা। নিজেকে চেনার এবং অপরের কাছে নিজেকে চেনাবার এক প্রাণান্তকর প্রয়াস চারটি চরিত্রকে রক্তাক্ত করেছে। পারাপারহীন অবসাদে একা একা কথা বলেছে চারটি বিচ্ছিন্ন সত্তা। তারা সকলেই বহুলাংশে Alienation-এর শিকার। সুতরাং চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস হিসেবে বাংলা সাহিত্যে 'জাগরী' এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত।

টিপ্পনী

□ 'জাগরী' উপন্যাস ঃ প্রসঙ্গ নামকরণ

সুনির্বাচিত নামকরণের মধ্যে নিহিত থাকে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা ও নিবিড় তাৎপর্য। 'জাগরী' শব্দের অর্থ 'জাগরণকারী', 'জাগরিত' বা 'বিনিদ্র প্রহর-যাপনকারী'। চেতনার আদিগন্ত জাগ্রত না হলে এ উপন্যাস রচনা করা সম্ভব নয়। সমগ্র সত্তার জাগরণ না ঘটলে এ উপন্যাস অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের আগুন-ঝরা দিনগুলিতে আসমুদ্রহিমাচলে জাগ্রত না হলে এই উপন্যাসের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রচিত হত না। তীব্র বেদনায় আর উদ্বেগ ভরা বিষাদে মানুষের অন্তরাত্মা জাগ্রত না হলে এ উপন্যাস শিল্পরূপ লাভ করত না। কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা সময়-চিহ্নিত নামকরণে এতখানি বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা সম্ভব হতো না।

'জাগরী' উপন্যাসের নামকরণ মূলত তিন রকমের তাৎপর্যে বিন্যস্ত ঃ ক) কায়িক জাগরণ, খ) রাজনৈতিক জাগরণ, গ) নিহিত সত্তার জাগরণ।

কায়িক জাগরণ ঃ

জীবনদেহের যাপন-শৈলীতে নিদ্রা এক স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রক্রিয়া। স্বাভাবিক মানুষের জীবন-শৈলীতে নিদ্রাহীনতা এক অভিশাপ। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসের প্রধান চারটি চরিত্র ১৯৪৩ সালের মে মাসের এক দুঃসহ রাত্রিতে চরম উৎকণ্ঠা আর বিষাদ বুকে নিয়ে পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেলের চারটি পৃথক স্থানে বিনিদ্র প্রহর যাপন করেছে।

ফাঁসি সেলে রয়েছে ফাঁসির আসামী 'বিলু'। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে ব্রিটিশ-বিরোধী ধ্বংসাত্মক মহাবিদ্রোহে নেতৃত্ব দানের অপরাধে সামরিক ট্রাইব্যুনালের বিচারে সে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়েছে। আগামীকাল ভোরে তার ফাঁসি হবে। স্বভাবতই উদ্বেগে, মৃত্যুভয়ে, হতাশায়, ক্ষোভে এবং নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করেছে সে।

'আপার ডিভিসন ওয়ার্ডে রয়েছেন গান্ধীবাদী মাস্টার সাহেব-'বাবা'। তৎকালীন ভারতের বড়লাট লিনলিথগোর দমন-নীতির শিকার হয়ে 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের দিনগুলিতে তিনি করাবন্দী হয়েছেন! বড়ো ছেলে বিলুর ফাঁসির পূর্বরাত্রে স্বভাবতই তিনি উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, বিষাদ, অসহায়তা আর দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে জেগে আছেন।

'আওরৎ কিতা'য় রয়েছেন মাস্টার সাহেবের স্ত্রী এবং বিলু ও নীলুর 'মা'। স্বামীর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যবশত তিনিও গান্ধীবাদী কংগ্রেস-কর্মী। ১৯৪২-এর আগস্ট

মাসের অগ্নিগর্ভ দিনগুলিতে তিনিও কারাগারে বন্দিনী হয়েছেন। প্রিয় পুত্রের ফাঁসির সংবাদে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। স্বাভাবিকভাবেই বিলুর ফাঁসির পূর্বরাত্রে গোধূলি থেকে ভোর পর্যন্ত তিনিও জেগে আছেন মর্মভেদী যন্ত্রণা নিয়ে।

'জেলগেটে' সারারাত প্রতীক্ষায় রয়েছে বিলুর ছোটোভাই নীলু। ভোরবেলা সে দাদার মৃতদেহ সৎকারের জন্য নিয়ে যাবে। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি-পত্র রয়েছে তার পকেটে। প্রধানত তারই সাক্ষ্যদানের ফলে বিলুর প্রাণদন্ডের আদেশ হয়েছে। কিন্তু দাদার ফাঁসির পূর্বরাত্রে নীলুর ভ্রাতৃসত্তা সুতীব্র বিবেক-দংশনে আক্রান্ত হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হলেও দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়াটা হয়তো অমানবিক নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক - এই অন্তর্দ্বন্দ্বে সে সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র প্রহর যাপন করেছে।

টিপ্পনী

শুধুমাত্র এই চারটি চরিত্রের কায়িক জাগরণ নয়, তাঁদের স্মৃতি-প্রবাহে সমস্ত কারাগারের জাগরণ বিবৃত হয়েছে। জেগে আছে জেল-ওয়ার্ডার, সান্ত্রীবৃন্দ, ম্যাজিস্ট্রেট, জেল-ডাক্তার, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সিভিল সার্জন, জেলর, অঘোরবাবু, অ্যাসিস্টেন্ট জেলর, 'স্নিফার ডগ', সুবেদার, নেহাল সিং, সরস্বতী, লুসী জমাদারণী, মনচনিয়া, বহুরিয়াজী প্রমুখ চরিত্র। জেগে আছে কারাগারের প্রাচীর, পাগলা ঘন্টা, উঁচু ওয়াচ্ টাওয়ারে সতর্ক রক্ষীর চোখ। জেগে আছে ফাঁসির দড়ি ও ফংাসিমঞ্চ।

সুতরাং আক্ষরিক অর্থে একটি কারাগারের সঙ্গে সম্পৃক্ত বহু মানুষের এবং একটি সংকটাপন্ন রাষ্ট্রীয় পরিবারের চারজন সদস্যের কায়িক জাগরণের তাৎপর্যে 'জাগরী' সার্থকনামা উপন্যাস।

রাজনৈতিক জাগরণ ঃ

১৯৪২-এর ৮ আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি 'ভারত ছাড়ো' তথা 'আগস্ট প্রস্তাব' গ্রহণ করে। গান্ধীজী দেশবাসীকে শপথ নিতে বললেন, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। ৯ আগস্ট ভোরে বড়লাট লিনলিথগো কংগ্রেসের এই আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্য বোম্বাই-এ সমবেত সকল শ্রেণির কংগ্রেস নেতাকে অকস্মাৎ গ্রেপ্তার করেন। এর ফল হল ভয়াবহ। নেতাদের পাশবিক গ্রেপ্তারে আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত ভারতবাসী ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সহিংস বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিল দিকে দিকে। হিংস্র জনতা অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সহসা জাগ্রত ভারতবাসী নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়। বিদ্রোহী নেতারা বহু স্থানে সমান্তরাল সরকার গঠন করেন। সরকার শেষপর্যন্ত ভারতে সমবেত বহু মার্কিন, ব্রিটিশ, কানাডিয়ান ও অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যের সহায়তায় বর্বর পদ্ধতিতে এই মহাবিদ্রোহ দমন করে। 'জাগরী' সেই মহাজাগরণের ইতিবৃত্ত। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসে দেশব্যাপী গণদেবতার স্বতঃস্ফূর্ত মহাজাগরণকে পরম নিষ্ঠা সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। সতীনাথ উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

"রাজনৈতিক জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই আলোড়নের তরঙ্গবিক্ষোভ কোনো কোনো স্থলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিতেও আঘাত করিতেছে।"

'জাগরী'র 'মাস্টারসাহেব' সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে স্বরাজের যুদ্ধে ঝাঁপ দেন। গৃহী মানুষ হয়ে ওঠেন সর্বত্যাগী বিপ্লবী সন্ন্যাসী। রাজনৈতিক জাগরণ ছাড়া এতখানি আত্মত্যাগ

সম্ভব ছিল না। এই উপন্যাসে গান্ধীবাদী কংগ্রেস, সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেস, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির ত্রিধা-বিভক্ত রাজনৈতিক জাগরণের স্বরূপ ও সংঘাত প্রদর্শিত হয়েছে। গণদেবতার মহাজাগরণ তথা রাজনৈতিক সচেতনতার দিক থেকেও 'জাগরী'-র নামকরণ সফল ও যথাযথ।

নিহিত সত্তার জাগরণ ঃ

টিপ্পনী

মানুষের সামাজিক, পারিপার্শ্বিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ের মধ্যে একটা অনিবার্য অসম্পূর্ণতা থাকে। রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কের মধ্যে, পারাপারহীন দুঃখের মধ্যে, গভীর মানস-সংকটের মধ্যে পতিত হলে মানুষের অন্তর্লোকের 'গোপন আমি'-র স্বরূপ উপলব্ধি করে মানুষ নিজেই। 'জাগরী'-র বাবা নিজেকে সাংসারিক আসক্তি-মুক্ত, মমতা-রিক্ত, স্নেহ-বিবিক্ত রাজনৈতিক কর্মী রূপেই জানতেন। কিন্তু পুত্রের ফাঁসির পূর্বরাত্রে তাঁর অন্তর্লোক থেকে জাগ্রত হয়েছে একজন পুত্রস্নেহে দুর্লব পিতা, স্ত্রী প্রতি কর্তব্যবোধ ও প্রীতিপরায়ণ একজন স্বামী। পুত্র-বিয়োগের সম্ভাবনায় কাতর পিতা হিসেবে শিশুর মতো আর্তনাদ করেছেন ঃ

ক) "চোখ ফাটিয়ে জল আসিতেছে।...সংযমের বাঁধ বুঝি আর থাকে না। আর তো নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিতেছি না।"

খ) "আজ আমি ইহাদের এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছি যে অন্তিম মুহূর্তে বিলুর মা বিলুকে নিজের কাছে পাইবেন না। অনেক জানোয়ার নিজের সন্তান খাইয়া ফেলে। আমি কি তাহাদেরই দলে?"

'মা' নিজেকে জানতেন জেলের এবং জেলার সমস্ত কংগ্রেস কর্মীর মা রূপে। সকলের চোখে তিনি 'দেবীজী'। স্বামীর আদর্শই তাঁর আদর্শ। গান্ধীজীর প্রতিটি নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন এতদিন। কিন্তু পুত্রের মৃত্যুর বিভীষিকাময় সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর বাইরের পরিচয়, রাজনৈতিক মুখোশ, বিশ্বজননীর খোলস ছিঁড়ে গেছে। গান্ধীজীকে, গান্ধীবাদী স্বামীকে, বিশ্বজননীর ভাবমূর্তিকে তিনি একেবারে নগ্ন ভাষায় নস্যাৎ করে ফেলেছেন ঃ

ক) "আমি রাজ্যশুদ্ধ লোকের মা; জেলের সব কংগ্রেস-কর্মীর মা; আমার তো বিশ্বজোড়া ছেলে। কিন্তু মন যে বিলু-নীলুর উপর পড়ে থাকে। এদের ছাড়া অন্য ছেলের মা হতে আমি চাই নি।"

খ) "এখন যদি একবার বিলুর বাবাকে কাছে পাই তাহলে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিই, যে দ্যাখো, বাপ হয়ে ছেলেদের কী পথে এনেছ? সারাটা জীবন আমার একই রকম গেল। নিজ একদিন শান্তি পেলাম না। ছেলেদের একদিন হাসিখুশী ফুর্তিতে থাকতে দিতে পারলাম না।"

গ) "গান্ধীজী, তুমি আমার একি করলে? তুমি আমাদের একেবারে পথের ভিখিরী করে ছেড়েছ; সত্যিকারের ভিখিরী।"

বিলু সকলের চোখে বাসনারিক্ত সংযমী যুবক। দেশপ্রেম, নেতৃত্ব, বক্তৃতা, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, জনসংগঠন ইত্যাদির মধ্যেই তার জীবনচক্র আবর্তিত হচ্ছিল এতদিন। কিন্তু অনিবার্য মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে সাধারণ মানুষের মতো মৃত্যুভয়, বেঁচে থাকার তীব্র আকুলতা। সবাই তাকে জিতেন্দ্রিয় বলে জানে। অথচ বিলু মৃত্যুর পূর্বে তার আপন সত্তার

মুখোমুখি হয়ে উপলব্ধি করেছে একদিন নীরেশের বিধবা তরুণী ছোট্-ঠাক্মার জন্য তার হৃদয় শূন্যতা বোধ করেছিল। সরস্বতীর প্রতি দুর্বলতার কথাও সে গোপন করেনি। তেত্রিশ বছর বয়সে কুকুর বিড়ালের মতো মৃত্যু তার কাম্য নয়। সে স্বীকার করেছে ঃ

"বোধ হয় নীলুর ব্যবহার আমার ভিতরের আসল আমি, কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতেছে না; তাই উপরের আমি পুরাতন স্মৃতির মধু দিয়া সেই দহনের জ্বালা স্নিগ্ধ করিতেছি।"

টিপ্পনী

-বিলুর এই ভাবনায় 'উপরের আমি'-র চাইতে 'ভিতরের আসল আমি' যে প্রবলতর সেকথা সহজেই পরিস্ফুট হয়েছে।

নীলুর ক্ষেত্রেও 'Inner soul'-এর জাগৃতি এক দুঃসহ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সে বিশ্বাস করতো তার সাক্ষ্যদানের ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। দাদার প্রতি তার কোনো বিদ্বেষ নেই। অথচ এই জাগ্রত রাত্রিতে সে নিজের অগচোরে স্বীকার করেছে তার ব্যক্তিগত জেদের কথা, অনমনীয় হঠকারিতার কথা, যা সাক্ষ্যদানের সময় রাজনৈতিক আদর্শের চাইতে বড়ো হয়ে উঠেছিল। তার বাইরের সপ্রতিভ সত্তাটি যতই বলেছে, 'পৃথিবীসুদ্ধ লোকের ভুল হইতে পারে, আমার ভুল হয় নাই'- কিন্তু তার অন্তর্গত সত্তাটি সে কথা সমর্থন করেনি ঃ

"সকল যুক্তিকে পরাস্ত করিয়া অন্তরের ভিতর কোথায় যেন খচ্ খচ্ করিয়া কি একটা বিঁধিতেছে।" দাদার প্রতি তার শ্রদ্ধা, আনুগত্য, ভালোবাসা যথখানি সত্য, অন্তরের প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা, হীনমন্যতাবোধের হাত থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টাও ততখানি সত্য। এই দ্বিধাবিভক্ত অন্তরাত্মার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তথাকথিত কম্যুনিস্ট নীলুও মনে মনে নিভৃতে স্বীকার করেছে ঃ

"মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার সময় নিজের রাজনীতিক Principle একটু নমনীয় করিয়া লইলে কী লোকসান হইত? ...রাজনীতিক মতবাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও বোধ হয় সেখানে আমার ব্যক্তিগত জিদের প্রশ্ন আসিয়া পড়িয়াছিল।"

শেষ পর্যন্ত নীলুর বাইরের 'আমি'কে অবনত করে জয়ী হয়েছে তার অনুতপ্ত 'Inner soul'। তাই আপাতত বিলুর ফাঁসি হচ্ছে না জেনে তার বুকের ওপর থেকে গুরুতর পাষাণভার সরে গেছে।

এভাবেই 'জাগরী'র চারটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে অন্তর্সত্তার জাগরণ ঘটেছে। সেই আত্মার জাগরণের মর্মস্পর্শী ইতিবৃত্তই হলো 'জাগরী'।

চতুর্থ অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর গল্প

□ দিবসের শেষে

জগদীশ গুপ্ত

টিপ্পনী

রতি নাপিতের বাড়ির অবস্থানের পারিপার্শ্বিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পের শুরু – বাড়ির পূর্বদিকে কামদা নদী, পশ্চিমে বাগান, উত্তরে বেণুবন, দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর বিস্তৃত শষ্যক্ষেত্র। একজন বাস্তুকারের দৃষ্টিতে এই বাড়ির অবস্থানগত দোষগুণ বিচার সাপেক্ষ। কিন্তু শুরুতেই এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পকার প্রকৃতির প্রাকৃত লীলার প্রতি রতি নাপিতের ঔদাসীন্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পাশাপাশি রতি যে 'বস্তুতান্ত্রিক' সে কথাও উল্লেখ করেছেন। মালিক যাদব দাসের আম-কাঁঠাল চুরি করে বাজারে বিক্রি করার কোনে চাক্ষুস প্রমাণ পাওয়া যায় নি – তাই তাকে সন্দেহের চোখে দেখলেও গ্রামে সে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র হিসেবেই পরিচিত।

রতি ও তার স্ত্রী নারানী প্রসবগৃহেই তিনটি পুত্র সন্তান হারিয়েছে। মৃত সন্তানগুলি নদীগর্ভে নিক্ষেপ করে পাঁচুগোপালের মাদুলি ধারণ করে পুণরায় পুত্র সন্তান লাভ করেছে। ছেলের নাম পাঁচু। পাঁচুকে হারানোর ভয়ে তার শরীরেও মাদুলি-তাবিজ-কবচ প্রভৃতি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেবতার দাক্ষিণ্য হিসেবে পাঁচুকে পেলেও দেবতার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে থাকতে পারে না নারানী। আর তাই সশঙ্ক উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটায় সে। বহু কাঙ্খিত পাঁচু একদিন হঠাৎ তার মা'কে বলে বসে ঃ

"মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে"

ছেলের এই সর্বনেশে কথা শুনে নারানী প্রাথমিকভাবে ভয়ানক চমকে উঠলেও পরে তার দুর্ভাবনা দূর হয়ে যায়। কারণ আজ পর্যন্ত পাঁচু অনেকবারই এই ধরণের অসংলগ্ন কথা বলেছে। রতি স্ত্রীর মুখে ছেলের ওই কথা শুনে ছেৎকে কঠোর কণ্ঠে শাসন করে দিয়েছে। কারণ তার মনে পড়ে গেছে অধর বকশির একটি ঘটনার কথা। অধর বক্শি নৌকা যাত্রা করার পূর্বদিন সন্ধ্যায় আবছায়া জ্যোৎস্নায় নিজের ছায়া দেখেই আঁতকে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত আতঙ্কের নিবৃত্তি ঘটলেও অধর বক্শি ও তার নৌকা আর ফেরে নাই।

গল্পের শুরুতে যে কামদা নদীর উল্লেখ করেছেন গল্পকার তার পরিচয় দিতে গিয়ে ভরা আষাঢ়ে শান্ত জল খরস্রোতা হলেও যে ভয়ের কারণ নেই তার কারণ নির্দেশ করেছেন ঃ

"এই নদী, কামদা, তার দুই তীর, আর তার জল তাহাদের চিরপরিচিত; এ নদী তো নরখাদিনী রাক্ষসী নহে, স্তন্যদায়িনী জননীর মতো মমতাময়ী-চিরদিন সে গিরিগৃহের সুপেয় শীতল নীর তাদের পল্লি-কুটিরের দুয়ার পর্যন্ত বহিয়া আনিয়া দিতেছে, তাকে ভয় নাই।"

রতির মুখে ছেলের অদ্ভুত উক্তি শুনে গ্রামের বাবু চৌধুরী মহাশয় ও অন্যান্যরা হেসে উঠেছিলেন। কারণ কামদা নদীতে কুমির কল্পনাতীত। আর তাই ছেলের ভয় দূর করতেই রতি একরকম জোর করেই পাঁচুকে নিয়ে নদীতে নাইতে যায়। জলে একটি কদাকার জানোয়ার দেখে

পাঁচু ভয় পেলে রতি জানিয়ে দেয় ওটা শুশুক। অতি সন্তর্পণে রতি ছেলেকে নিজের হাঁটুজলে টেনে এনে স্নান করিয়ে, গা-মাথা মুছিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

সেইদিন বিকেলে পাঁচু ও তার সঙ্গীরা ঘরে রাখা একটি পাঁকা কাঁঠাল চুরি করে খায়। কিন্তু কাঁঠাল ভাঙাতে সঠিক পদ্ধতি জানা না থাকায় কাঠালের রসে পাঁচুর সারা দেহ সিক্ত। তাছাড়া ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে সারা শরীর নোংরা করেছে। নারানী ছেলের এই কান্ডে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলেছে। রতির ঘুম ভেঙে যায়। সে পাঁচুকে ধুইয়ে আনার জন্য নদীতে নিয়ে যায়। পাঁচুর হাতে একটি খেলার ঘট ছিলো - সেটি হাতে নিয়ে পাঁচু অপরাধীর মতো বাবার আগে আগে চললো। রতি পাঁচুকে ভালোভাবে ধুইয়ে তুলে আনলো। কিছুটা দূরে উঠে পাঁচু তার খেলার ঘটের খোঁজ করলে দেখলো ঘটটি জলের ধারেই পড়ে আছে। পাঁচু বাবার সম্মতি নিয়ে ঘটটি আনতে গেল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই 'দুটি সুবৃহৎ চক্ষু' নিঃশব্দে পাঁচুকে টেনে নিয়ে গেল। ওপোরে যখন পাঁচুকে পুনরায় দেখা গেল তখন সে কুমীরের মুখে নিশ্চল। গল্পের সমাপ্তি অংশটি অতন্ত তাৎপর্যময় ঃ

"পাঁচুর মৃত্যু-পান্ডুর মুখের উপর সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিলো ...সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেলো।"

শুধু পাঁচুর মা সেই দৃশ্যের স্বাক্ষী হতে পারল না। সে তখন অচৈতন্য।

দিবসের শেষে ঘটে গেল জীবনের অন্তিম পরিণতি, যা নিরতির মতো তাড়া করে ফিরেছে গল্পের শুরু থেকেই। কোনো পূর্বাভাস না থাকলেও জীবনের ঘটমান বর্তমান যে পূর্ব নির্ধারিত তা গল্পের পরিণতির মধ্যেই প্রতিফলিত। যে কামদা নদীতে কুমীরের সন্ধান নিছক গল্পকথাতেও অবিশ্বাস্য সেই নদীতেই কুমীরের আবির্ভাব এবং পাঁচুর করুণ পরিণতি নিয়তির কাছে, ভবিতব্যের কাছে মানুষের অসহায়তারই প্রমাণ দেয়। আর তাই, পাঁচুর মুখের নিছক অসংলগ্ন কথাই শেষ পর্যন্ত জীবনের চরম বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। যে কামদা রতি-নারানীর তিনটি মৃত সন্তানকে গ্রহণ করেছে, সেই কামদাই চতুর্থ সন্তানের আকস্মিক ও অভাবিত মৃত্যুকে নীরবে বরণ করে নিয়েছে। কুমীর তো সেখানে উপলক্ষ মাত্র। যে কামদায় কেউ কখনো কুমীর দেখে নি, হয়তো ভবিষ্যতে আর কখনো দেখবে না সেই কুমীরই অনিবার্য নিয়তির মতো মৃত্যুরূপে পাঁচুকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

□ ছোট বকুলপুরের যাত্রী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পের কাহিনি বলতে কিছুই নেই। যেন একটি ছবি আঁকা শুরু হয়েছে একটি গ্রামগঞ্জের বুক-চিরে যাওয়া রেললাইনের মধ্যবর্তী রেলস্টেশন থেকে, আর ছবিটি শেষ হয়েছে একটি রেললাইন ও রেলস্টেশন থেকে দূরবর্তী এক গ্রামের প্রবেশপথের মুখে এসে। কাহিনির গুরুত্ব বেড়েছে তার দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী অংশে। ওই মধ্যবর্তী অংশের ছবিই যেন কাহিনির সর্বশেষ ছবি থেকে বেশি ব্যঞ্জনাগর্ভ। আমরা মধ্যবর্তী প্রসারিত ছবিতে নতুন একদল মানুষকে দেখি যারা শ্রমিকও নয়, কৃষকও নয়, কিন্তু এদের শ্রমের ফসলে জীবনধারণ

টিপ্পনী

করে নির্লজ্জভাবে এদেরই ধ্বংস করার হীন স্পর্ধা রাখে। কাহিনির দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী বিস্তারিত ছবিটির প্রসঙ্গ ও প্রকরণ অনন্য।

একটি লেট-করা ট্রেন সন্ধেয় থমথমে একটি স্টেশনে পৌঁছলে দেখা যায়, অল্প কয়েকজন মাত্র যাত্রী ট্রেন থেকে নামে এবং দ্রুত পায়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে যে যার গন্তব্যের উদ্দেশে ব্যস্ত হয়। গভীর রাতের অন্য ট্রেনের জন্য কিছু যাত্রী তখনো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করে। একদল সেপাই এই থমথমে সন্ত্রস্ত স্টেশনে পাহারায় ভিড় করে থাকে। তাদের উপস্থিতির কারণ, নতুন কোনো শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা। স্টেশন-সংলগ্ন একটি কারখানায় ধর্মঘট হওয়ার সময় ধর্মঘটী শ্রমিকদের তিনজন নেতাকে গ্রেপ্তারের পর ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়ার সময় শ্রমিকরা প্রচন্ড বাধা দিলে পুলিশের গুলি চলে, রক্তপাত হয়। তাই স্টেশন থমথমে, যাত্রীরা সন্ত্রস্ত। সৈন্য-পুলিশ ঘেরা। বাইরে থেকে সেই গ্রামে যাওয়া এখন ভীষণ কড়াকড়ি, অথচ দিবাকরকে যেতেই হবে। কারণ সে হাওড়ার কারখানায় ধর্মঘটের কারণে এবং ধর্মঘট সহজে মীমাংসা হবে না বুঝতে পেরে কদিন ছুটির মতো সুযোগ পেয়ে বউ আন্নার কান্নাকাটিতে তাকে নিয়ে ছোট বকুলপুরে আসছে। আন্নার কান্নাকাটি করে গ্রামে আসার তাগিদের কারণ - তার ভয়, গ্রামের মানুষের বিদ্রোহে আর সৈন্য-পুলিশের অত্যাচারে তার বাবা-দাদারা ভালো আছে কিনা তা জানা।

ছোট বকুলপুর নয়, তার আগে কদমতলা পর্যন্ত গরুরগাড়ি গিয়ে ওদের নামিয়ে দেবে - এই শর্তে গরুর গাড়ির জোয়ান চালক গগন ঘোষ দিবাকরদের যাত্রী হিসেবে নেয়। কিন্তু কদমতলা পর্যন্ত গিয়ে গগন তাদের বকুলতলা পর্যন্ত নিয়ে যাবারই সিদ্ধান্ত নেয়। বকুলতলা যাবার পথে সাত-আটজন জমিদার-জোতদারের পাহারাদার লোক গ্রামের বিরোধীদের সঙ্গে যোগসাজশ আছে এই সন্দেহে দিবাকরদের বাধা দেয়, অত্যন্ত অভদ্র, অশলীনভাবে তাদের ধমক দেয়, খোঁজখবর নেয় ও তল্লাশি করে। দিবাকরের হাতে পান-মোড়া কাগজে লেখা ছিল 'ছোট বকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি!' - যা দেখে তাদের সন্দেহ দৃঢ় হয়। এবার নতুন করে তারা তাদের কঠিন প্রশ্নে জানতে চায় দিবাকর ও আন্নার আসল নাম কি? অত্যন্ত সহজ-সরল এই স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে দেখার নিশ্চুপ অসহায়তার মুখচ্ছবির মধ্যে গল্পটি শেষ।

কাহিনি যেমন খুবই সংক্ষিপ্ত, তেমনি এর বিষয়বস্তুও তীক্ষ্ন। গল্প দিবাকর-আন্নাকে কেন্দ্রে রেখে গ্রাম-পাহারাদারদের আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় গড়ে উঠেছে। বৃত্ত পরিকল্পনা সার্থক ছোটোগল্পের উপযোগী নিটোল, সংযত।

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পে রাজনীতি আছে, কিন্তু সে রাজনীতির উপস্থিতি প্রত্যক্ষ বাস্তবাতার নয়, শিল্পের বাস্তবতায় সর্বজনীন আস্বাদ দেয়। লেখক যেহেতু সাম্যবাদে দীক্ষিত একজন সচেতন ক্ষমতাবান শিল্পী তাই তার রচনায় সমকালীন রাজনীতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলবে এটাই স্বাভাবিক। এই গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতিকে প্রত্যক্ষভাবে নেননি, তার উত্তাপকে তথ্যের সত্যে শিল্পসম্মতভাবে ব্যবহার করেছেন। একদিকে মালিক শ্রেণি, কৃষির ক্ষেত্রে জমিদার-জোতদার শ্রেণি, অন্যদিকে সর্বহারা শ্রমিক ও কৃষকের দল। এদের মধ্যবর্তী হলো মধ্যস্বত্বভোগী দালাল শ্রেণি। এই শ্রেণির উদ্ভব বুর্জোয়া অর্থনীতি ব্যবস্থায় ও সমাজে একান্ত স্বাভাবিক। সমাজ ও সমাজ-অর্থনীতিই এর মূলে সক্রিয়।

আলোচ্য গল্পে লেখক প্রথমেই প্রসঙ্গ এনেছেন স্টেশন সংলগ্ন এক মিলে ধর্মঘট বিষয়;

টিপ্পনী

শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ চেতনা ও তাদের তিনজনকে মালিকের নির্দেশে পুলিশের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে সর্বহারাদের রক্তপাতের চিত্র। গল্প ক্রমশ এগিয়েছে কৃষিনির্ভর গ্রাম বকুলপুরের কৃষকদের প্রতিবাদী ভাবনার দিকে। অর্থাৎ গল্পের মধ্যে রাজনীতির বিষয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আদ্যন্ত স্পষ্ট। অন্যদিকে আছে সংঘবদ্ধ শ্রমিক ও কৃষক। নায়ক দিবাকর হাওড়ার এক ধর্মঘটে বন্ধ মিলের শ্রমিক। তার শ্বশুরালয় এক কৃষিনির্ভর গ্রাম বকুলপুরে। তার স্ত্রী আন্না কৃষক পরিবারের সদস্য জন্ম থেকেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুকৌশলে একই সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষক-দুই শ্রেণির প্রতিনিধিত্বমূলক পরিস্থিতি তৈরি করেছেন গল্পে। গরুর গাড়ির চালক গগন ঘোষও খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি। তার সহমর্মিতা দিবাকর-আন্নাদের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। বোঝা যায়, লেখকের নায়ক-নায়িকা চরিত্রের বিস্তার গল্পের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হলো শ্রমিক কৃষকদের বিরোধী শক্তির এক-অংশের সুবিধাবাদী চেহারাটা তুলে ধরা।

টিপ্পনী

কিন্তু সেটাই রাজনীতির আর এক রূপ। গল্পের প্রথমেই লেখক এঁকেচেন স্টেশন-সংলগ্ন ধর্মঘটে স্তব্ধ কারখানার মালিকের কিছু ভদ্রবেশী দালালদের। এই সম্প্রদায় সাংকেতিকতায় চিত্রিত। লক্ষ করার বিষয়, গল্পে এরা কেউই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নয়, রাজনীতির একটা কৌশল। আর এই কৌশলকে শিল্পসম্মতভাবে প্রয়োগ করাতেই গল্পে শিল্প প্রধান, রাজনীতি গৌণ। গল্পের প্রথম অংশে কারখানার মালিকদের দালালদের চিত্র, মধ্য ও শেষ ভাগে জোতদার-জমিদারের নিয়োগ করা মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের ছবি। গল্পের অন্তিম ব্যঞ্জনা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির নয়, সমষ্টি মানুষের অসহায় জীবন যাপনের ক্ষত মুখ চিহ্নিত করে। গগনের উক্তি ঃ 'মোদের ছেলে-পুলেরা ফের সত্য-যুগ করবে'-এই কথায় সমষ্টি মানুষের সংগ্রামী বিশ্বাস ও আশা ধ্বনিত। দিবাকর-আন্নার সম্ভাব্য বিড়ম্বনা, অত্যাচারের ব্যঞ্জনা দিয়েই গল্পের শেষ।

স্থানীয় শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের আবহাওয়ায় রাজনীতির তাপে সমষ্টি মানুষের অসহায় জীবনের গল্প বলেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনীতি আছে প্রেক্ষিতের ব্যঞ্জনায়, গল্পের প্রত্যক্ষ স্বভাবে নেই। এখানে আছে রাজনীতি-জ্ঞান বঞ্চিত দালালদের মালিক-জোতদার নির্দেশিত অশুভ তৎপরতার নির্লজ্জ, নির্বোধ চিত্র। রাজনীতি হলো উদ্দীপন বিভাব, আসল লক্ষ্য হলো সমষ্টি মানুষের ও জীবনের পক্ষে বেঁচে থাকার ভাবনা। রাজনীতির শ্রেণিচেতনা গল্পের বাঁধুনি শক্ত করেছে, প্রকরণকে করেছে বিশ্বাস্য, কিন্তু মূল লক্ষ্য শিল্প দিয়ে জীবন ও তার বস্তুবতাকে সুন্দর করে তোলা।

□ ইঁদুর

সোমেন চন্দ

'ইঁদুর' গল্পে অবধারিতভাবে এসেছে মধ্যবিত্ত পরিবারের অসহায়তার দিক-তা যতই প্রতীকী হোক না কেন। কিন্তু লেখকের ভাবনায় টানা আখ্যান দানা বাঁধেনি, টানা গল্প বলার একজাতীয় বিলাস থেকে সরে এসে বিশ্ববাজারের কথা ভেবেছেন, যুদ্ধের অভিঘাতের ক্ষেত্রগুলি সামনে রেখে বুর্জোয়া অর্থনীতির চরম বৈষম্যের ভূমিচিত্র মধ্যবিত্তকেই সচিত্র করেছেন গল্পকার। গল্পের মূল কথক সুকুমার নামে সচেতন, একই সঙ্গে রোমান্টিক ও বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন যুবক। সে উত্তমপুরুষে গল্পের একই সঙ্গে বক্তা বা কথক এবং দর্শক দুই-এর ভূমিকায় স্থিত থেকেছে।

গল্পের কথক সুকুমার। সে যে তাদের বাসায় ইঁদুরের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত-এই খবর দিয়ে

তার কথা বলা শুরু করেছে। দিনে-রাতে সব সময়ই তাদের দলবদ্ধ উৎপাত। বরং রাতে আরও ভয়ঙ্কর। ওদের প্রতিরোধ করার জন্য একটা কলও বাড়িতে কিনে রাখার মতো পয়সা নেই। শুধু সুকুমার না, ওর মা-ও ইঁদুরকে রীতিমত ভয় পান। ইঁদুরের গন্ধ পেলে মা সন্ত্রস্ত হনস ভয় পান, আবার ঘৃণাও করেন। ইঁদুর নিয়ে সুকুমারের প্রতিক্রিয়া বিচিত্র। যেমন ভয় পান তিনি, তেমনি ইঁদুর মারায় তাঁর আপত্তি। যুক্তি-ওরা অবোধ প্রাণ, কথা বলতে পারে না তো! তাছাড়া কল আনতে গেলে তো পয়সা দরাকর! তার সাশ্রয় কি করে সম্ভব? ইঁদুর নিয়ে বিষম বিরক্তির মধ্যে আবার একদিন সুকুমারের মায়ের ভয়ার্ত চিৎকারে সুকুমার তটস্থ হয়। এবার কখনো-কখনো বাড়িতে দুধ আনার পর দুধের খোলা ভাঁড়ের কাছ দিয়ে ইঁদুর দৌড়ানোর ফলে মায়ের মুখ গভীর শোকে পান্ডুর হয়ে যায়, করুণ দুই চোখে জল ভরে ওঠে, মা কেঁদে আকুল হন। সন্ধেয় বাড়ি ফিরে বাবা খবরটা শুনে নির্বিকার, কিন্তু বিষয়টাকে ব্যক্তিগতভাবে গুরত্ব না দিয়ে যুক্তি দেন ঃ 'মানুষের জান নিয়েই টানাটানি, দুধ খেয়ে আর কী হবে বলো!' আরও যুক্তি দেন - তাঁর পরিশ্রমের টাকায় বাড়ির লোক ফুর্তি করে, তাঁর দিকে কেউ তাকায় না। এই সব কথা সুকুমারের কাছে মারাত্মক হয়ে বাজে। সুকুমারের মনে হয় এমন কথার পেছনে আছে বিপুল রাগ আর অসহিষ্ণুতা। দুধ নষ্ট হওয়ার প্রতিক্রিয়া মা ও বাবার সম্পর্কের মধ্যে চিৎকার সৃষ্টি করে। সেই চিৎকার থেকে মা-বাবার ঝগড়ার সূত্রে অশালীন শব্দপ্রয়োগ বাবার দিক থেকে - কানে আসে সুকুমারের। মনে মধ্যে লজ্জা, অস্বস্তি, আড়ষ্টতা, ভয় দেখা দেয়।

ঝগড়ার পরিবেশ থেকে অশ্রুসজল মা সরে এসে সুকুমারের ঘরের মেঝেয় আঁচল পেতে শুয়ে পড়েন। পরের দিনও আবহাওয়া থমথমে, মা অস্বাভাবিক নীরব। সেই সুযোগে সুকুমারের ছোটো ভাইবোনেরা যথেচ্ছ স্বাধীনতার সুযোগ নিতে থাকে। সেদিন রাতে রান্না চাপতে অনেক দেরি হয়। মধ্যরাতে বাবা-মায়ের অন্তরঙ্গ সখ্যতা ও প্রীতির সম্পর্ক, প্রৌঢ়া মা কনকলকাতার নীরব দূর হওয়া, বাবার গুঞ্জন-স্বভাবে মিষ্টি গলার গান, তার মাধুর্য ও গভীরতার স্বভাবে সুকুমার মুগ্ধ হয়ে একসময়ে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যায়।

পরের দিন ভোরে বাবার অসাধারাণ খুশির ডাকের মধ্যে সুকুমারের ঘুম ভাঙে। বাবা সুকুমারের বিছানার মশারির দড়ি খুলতে খুলতে খুশির মধ্যে নানা কথা বলতে থাকেন। পরের দিন দুপুরে ইউনিয়ন করতে আসার সময় আলাপ-হওয়া শশধর ড্রাইভারের দেখা হয় সুকুমারের রেলওয়ে ইয়ার্ডের পথে। আবার বিকেলের দিকে দেখা হয় ইয়াসিনের সঙ্গে, ইউনিয়ন নিয়ে কথাবার্তাও হয়। কথা হয় দেশের বিপ্লব ভাবনা নিয়েও। ইউনিয়নের কাজ নিয়ে যুক্তিতর্ক চলে। এসবের প্রেক্ষিতে সুকুমারের মনের গভীরে এক প্রতীকী অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা জন্ম নেয়। সুকুমার নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে বাসায় ফেরে। এর কয়েকদিন পরে এক ভোরে সুকুমারের বাবাকে দেখা যায় রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইঁদুর-মারা কল হাতে বোকার মতো অনর্গল হাস্যমুখর হতে। তাঁর পাশে দারুণ খুশিতে নারু ও মন্টুও উচ্ছল। কয়েক মুহূর্ত পরে আরো অনেক ছেলে জড়ো হয় সেখানে। পাশে একটা কুকুরও এসে দাঁড়ায়। যারা সাহসী ছেলে, তারা লাঠি, ইট ইত্যাদি নিয়ে রাস্তার ধারে বসে প্রস্তুতি নেয়। এই প্রস্তুতির মূল লক্ষ্য, ইঁদুরকলে কয়েকটি ইঁদুর ধরা পড়েছে। এই দৃশ্যেই গল্পের সমাপ্তি।

ইঁদুর গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবনা ধরেই গল্পচি সামগ্রিক অবয়বের শৈল্পিক বুনন। আর এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় প্রতীক হয়েছে ইঁদুর-একটি নয়, দলবদ্ধ। আমাদের ভাবনায় ইঁদুর জাতীয় জীবনগুলি মধ্যবিত্তদের ঘরেই আপাত স্বস্থির বড়ো আশ্রয় পায়। মধ্যবিত্তদের বুর্জোয়া অর্থনৈতিক দুরবস্থার

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সুযোগ নিয়ে সুখের বসবাস এবং অত্যাচার যাই বলা যাক না কেন, তাতেই নিমগ্ন থাকে। 'ইঁদুর' গল্পে প্রধানত এবং একমাত্র ভাঙন-ধরা মধ্যবিত্ত সংসার, সমাজ-এর প্রেক্ষিত হয়েছে জীবন্ত। বুর্জোয়া অর্থনীতি ও সমাজরূপের কারণে মধ্যবিত্তের সংসারে অনেক অন্ধকার গর্ত তৈরী হয়। চরম অসহায় দারিদ্র তাদের জন্মদাতা ও রক্ষাকর্তা। সেইসব গর্ত ও গর্তবাসী ইঁদুরেরা সেসবের অধিবাসী। মধ্যবিত্ত সংসারের এত সব গর্ত ধীরে ধীরে তৈরি হয় বিশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দু'দশক ধরে। তার ওপর বীভৎস পরিবেশ দেখা দেয় সাম্রাজ্যবাদী লোভ-এর ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার সূত্রে। গল্পে প্রথম থেকে শেষের আগে পর্যন্ত মধ্যবিত্তের এই চরম ঘৃণা রূপেই 'ইঁদুরে'র প্রতীকী ব্যঞ্জনার বড়ো দিক।

সুকুমার শেষে যে রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে প্রসারিত করেছে তাতে মেলে প্রতীক ইঁদুরের আর এক ডাইমেনশান্। মনে হবেই শেষের এই রাজনৈতিক টীকাভাষ্য সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের ঘৃণ্য আচার-আচরণও স্বরূপের প্রতীক হয় ইঁদুর। এই ব্যাখ্যায় ইঁদুর হলো সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক ধর্ষণস্বভাবে মানুষের জীবনকে ইঁদুর করে তোলা, ইঁদুরের মতোই তাদের শোষক করে তোলা। মানুষকে ইঁদুর করতে পারলে সাম্রাজ্যবাদ ও নিকৃষ্ট ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠার মাটি হবে কঠিন। গল্পের নায়ক সুকুমার গল্পের শেষ রাজনৈতিক চিত্রে সেই মানুষকে ইঁদুর বানানোর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদী হতে চেয়েছেন। গল্পের শেষ রাজনীতি ভাবনায় যে তত্ত্বকথা, তা শিল্পের সূত্র ধরে আসেনি, এসেছে সুকুমারের ও গল্পকারের প্রতিবাদী স্বরূপ ধরেই।

মূলত 'ইঁদুর' গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবনায় আছে গল্পকারের বিচিত্র ভাবনার মিশেল। মন ভালো থাকায় সুকুমারের বাবার কথা ঃ

"তোমরা থিয়োরিটা বার করেছ ভালোই, কিন্তু কার্যকরী হবে না, আজকাল ওসব ভালোমানুষি আর চলবে না। এখন কাজ হল লাঠির। হিটলারের লাঠি,..." গল্পের শেষে রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে ফিরে এসে সুকুমারের স্বীকারোক্তি ঃ

"আমি ফিরে এলুম। সাম্যবাদীদের গর্ব, তার ইস্পাতের মতো আশা, তার সোনার মতো ফসল বুকে করে আমি ফিরে এলুম।"

এরপরেই বাবার ইঁদুরকলে কয়েকটা ইঁদুর ধরা পড়ায় তাদের মারার জন্য নারু-মন্টুর উৎফুল্ল নাচ, কয়েক মিনিটের মধ্যে আরও ছেলেদের জমায়েত হওয়া এবং সেইসঙ্গে উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে সাহসীদের লাঠি, ইট নিয়ে ইঁদুরদের মেরে ফেলা চিত্র অঙ্কিত। একা নয়, একটি ইঁদুরকল নয়, সমস্ত মানুষের সমবেত সবল প্রতিরোধেই, প্রতিবাদেই ইঁদুরদের অর্থাৎ ফ্যাসিবাদের বিনাশ ঘটবে-এই বিশ্বাসের ব্যঞ্জনাগর্ভ সমবেত প্রস্তুতির চিত্র। গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য নায়ক সুকুমারের আদ্যন্ত কথনে গুরুত্ব পেয়েছে।

'ইঁদুর' গল্পটির শীর্ষনাম অবশ্যই প্রতীকী। এই প্রতীক গল্পটির বিষয় গৌরবের সীমাহীন এবং বাস্তব রস-ব্যঞ্জনাকে সু-শিল্পের যথার্থ্যে যথোচিত মর্যাদা দেয়। যে কোনো সৃষ্টিধর্মী রচনার শীর্ষনাম সমগ্র গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টিকে পড়ার সময় আদ্যন্ত গভীর-নিবিষ্ট রাখে। গল্পের নামে নায়ক বা নায়িকা চরিত্র থাকতে পারে, থাকতে পারে ব্যাখ্যার সংযত অথচ বিস্তারিত বাক্যবন্ধ। আবার ব্যঞ্জনার কথা ভাবলে গল্পনামে থাকে প্রতীক প্রয়োগের সূক্ষ্মতম অর্থদ্যুতি - যা স্বভাবী পাঠকদের স্বতন্ত্র স্বাদ ও স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞতায় ধরে রাখে। 'ইঁদুর' গল্পের

নাম তাই স্থূল কোনো চিন্তাভাবনার অনুগ বিষয় হয় নি, হয়েছে লেখকের জীবনকে স্বচ্ছ স্বভাবে দেখার দর্পণ, যার মধ্যে প্রতিফলিত আছে গল্পের সঠিক শিল্পরূপ।

□ আঙুরলতা
বিমল কর

টিপ্পনী

'আঙুরলতা' গল্পটি যে বেশ্যার কাহিনি তার চিত্র একেবারে যেন কোনো এক নিপুণতম শিল্পীর হাতে প্রতিমা গড়ানো। আমাদের বাংলা সাহিত্যে বেশ্যার কাহিনি দুর্লভ নয়। তবু আঙুরলতার কাহিনি এক অন্যমাত্রা দান করেছে। 'আঙুরলতা'র কাহিনি-চিত্র আমাদের crude reality-র সামনে নিয়ে আসে-সে reality মানুষের জীবন ও মৃত্যুবোধের, দেহ ও আত্মার এক জাটিল সম্পর্কের সংকট-ভাবনার।

'আঙুরলতা'-র কাহিনিবৃত্ত একটি বক্তব্যকে ঘিরে চরিত্রের আধারে সম্পূর্ণতা পেয়েছে। গল্পের প্রথমে ঘটেশে বেশ্যা আঙুরের ঘরে তার এক পরিচিত খদ্দের, যে তার জীবনেও প্রথম মানুষ ছিল এবং সে সময়ে স্বামী-স্ত্রীর খেলা খেলে একসঙ্গে এক বছরের ওপর কাটিয়েছে-সেই নন্দ চক্রবর্তীর মৃত্যু-ঘটনা। তার ঘরেই এমন মৃত্যু ঘটনায় আঙুরলতা এক অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হয়। এমনিতেই তার শরীরে অসুখ থাকায় ডাক্তারের কথায় বেশি খদ্দেরের কাছে সে যেতে পারে না। অর্থ-সংস্থানের জন্য এবং তার ওপর নন্দকে দাহ করার জন্য যে খরচ তার জন্য কোনো উপায় সে খুঁজে পায়না।

কোনোরকমে নিজের সামান্য কিছু পয়সা এদিক-ওদিক থেকে জোগাড় করে সে আরো পয়সার খোঁজে বেরোয় তাদের বেশ্যাপট্টির মধ্যেই। হিমুর কাছে ধার পায় কিছু, আতার কাছে একটা পুরনো শাড়ি বিক্রি করে কিছু পায়। বেদানা মাসি তো এমন মৃত্যু-ঘটনায় রেগে-মেগে তাকে মেথর মুদ্দফরাস দিয়ে বাইরে টেনে ফেলে আসার যুক্তি দেয়। আঙুর তা ভাবতেই পারে না। নন্দ তার যত ক্ষতিই করুক, তবু ব্রাহ্মণ মানুষ, আর মরা কুকুরের মতো টানতে টানতে নন্দকে ফেলে দিয়ে আসার ব্যাপারটা আঙুরকে শিহরিত করে। যা টাকা জোগাড় হয় তাতে ওদের পরিচিত বিশু জানায়, মড়া পোড়ানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়, খরচ আরো বেশি পড়বে। আঙুর ভোটের সময় প্রার্থী হয়ে ভোট ভিক্ষে করতে আসা মানিক মুন্সীর কাছেও সাহায্য চেয়ে পায় না।

শেষে যে কামুক প্রভুলাল-সাজানো আতরের দোকানে বসে, বীভৎস দেখতে, আঙুরের চিরকালের ঘৃণার মানুষ, যার একটা চোখ 'মাছের পিত্তির মতন পচাগলা, সবুজ, ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, ঝুলে পড়েছে', তার কাছেও নানা ছলা-কলার পর টাকা ধার চেয়ে ব্যর্থ হয়ে শেষে তাকে নিয়ে নিজেরই ঘরে বিছানায় শুয়ে টাকা জোগাড় করে। নন্দর মৃতদেহ সেই বিছানার চৌকির নিচে সাময়িকভাবে লুকিয়ে রাখে আঙুর, ঘর অনেকটা অন্ধকারে ঢেকে রাখে। সেই টাকায় বিশুরা চারজন মিলে শ্মশানে দাহ করে নন্দর মড়া। এমন দাহ করার ব্যবস্থায় নন্দর মুখে আগুন দেবার সময় আঙুর নিজের দেহের অশুচিতার কথা, গঙ্গা-স্নানে শুচি হওয়ার বাসনা ও পরে বিশেষ এক উপলব্ধিতে গঙ্গার পবিত্রতাকে লাথি মেরে উপেক্ষা করে। আগুনের মধ্যে তার জগতের মানুষজন, ভালোবাসা, সংসার, মানুষের মন, তাদের আচার-আচরণ - এসবের কথা ভাবতে ভাবতে একটু আগের মৃত্যু-ভাবনা থেকে সরে আসে এবং শেষে নিজস্ব এক

গভীর উপলব্ধির জগতে চলে যায়। সেখানে সে সিদ্ধান্ত নেয় – "আর সে মরবে না, কাঁদবে না।" এখানেই গল্পের সমাপ্তি।

বিমল কর মানবিক চরিত্র ও মানুষের চরিত্র – উভয় বিষয়েই এক সিদ্ধকাম শিল্পী। আঙুরলতা চরিত্রে ত্রিস্তর dimension-প্রথম স্তরে নন্দর ওরই ঘরে মৃত্যু নিয়ে নন্দ সম্পর্কে ও তার মৃত্যু সম্পর্কে নিষ্ঠুর নিরাসক্তির প্রকাশ। দ্বিতীয় স্তরে নন্দর সৎকারের জন্য একটা সংস্কার ও মানবিকবোধের তাড়নায় অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে থাকতে অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে চরম শূন্যতায় এসে নিজেরই ঘরে নন্দর মড়া লুকিয়ে প্রভুলালের কাছে দেহদান করে অর্থ উপায়ের ব্যবস্থা। তৃতীয় স্তরে নন্দর চিতা জ্বলতে থাকার সময় শ্মশানে তার নিজেরই এক গভীরতম উপলব্ধির জগতে চলে আসার অভিজ্ঞতা অর্জন। এই অভিজ্ঞতা অবশ্যই জীবন, জগৎ, পরিপার্শ্ব, সংসার – সব কিছুর মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার একটা স্থায়ী সিদ্ধান্ত-ভাবনা।

টিপ্পনী

প্রথম দিকে আঙুর নন্দর মৃত্যুতে এতটুকুও কাঁদেনি-যা যে কোনো মৃত্যুতে কোনো প্রত্যক্ষদর্শী রমণীর পক্ষে অস্বাভাবিক বলে মনে হবে। এমন মৃত্যুর জন্য সে বরং নিজের মনে তীব্র গালাগাল দিয়েছে নন্দকে – রাগে ভিতরটা জ্বালা করে উঠেছে ওর। নন্দ ওর কাছে 'পাজী নচ্ছার' একটি মানুষ। সে নন্দর মৃত্যুর জন্য এতটুকুও চোখের জল ফেলেনি, কিন্তু তার সমস্ত রকম তীব্রতম ঘৃণার মধ্যে, রাগের মানসিকতার মধ্যে বছর পাঁচেক আগেকার নন্দকে মনে পড়ে যেতে চোখে জল আসে। সে জল মৃত্যুজনিত নয়, স্মৃতির বেদনাজনিত, কিছু অর্থে নস্ট্যাল্‌জিক।

নন্দ চক্রবর্তীই আঙুরকে বের করে এনেছিল ভালোবাসা দিয়ে। এক বছর চরম ভোগের পর ছেড়ে চলে যায়। স্বামী-স্ত্রীর খেলা ছিল তার মধ্যে। সেই অতীতের সম্পর্কের নয়, একটা মানবিক ধর্মে ও সংস্কারেই আঙুর চায় না নন্দর দেহ মেথর-মুদ্দফরাসে নিয়ে যাক মৃত কুকুরের মতো রাস্তা দিয়ে টেনে টেনে। তাই যা তার শরীরের পক্ষে বারণ ডাক্তারের পরামর্শমতো, তাতেও সে পয়সা জোগাড় করে। প্রভুলালকে দেহ দেয় গভীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও চৌকির নিচে সেই মৃতদেহ পড়ে-থাকা ঘরের বিছানায়।

আঙুরের এমন ভাগ্যের পরিহাস গল্পের শেষে আনে তার অন্য উপলব্ধি। সেখানেই চরিত্রের এবং গল্পের গভীরতম ব্যঞ্জনা। যে গভীর ঘন অন্ধকার-জীবনে অভ্যস্ত আঙুর, সেই জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে আর এক আলোর দিকে নিয়ে যায় – সেখানে তার অভিজ্ঞতা নিরাসক্তভাবে বাঁচার শিক্ষা দেয়। এক বেশ্যার পক্ষে তা শুধু সত্য নয়, সমস্ত মানুষের জীবনের পক্ষেও তা সমান গ্রাহ্য। আঙুরের কাছে প্রথমে মনে হয়েছিল তার এমন ভাগ্যের জন্য দায়ী পাষন্ড নন্দই, কিন্তু শ্মশানে চিতার আলোয় সে দেখে মানুষ, তার রীতিনীতি, তার সংসার, দেহ, পবিত্র গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত রকম সংস্কার-ভাবনা, মানুষের দেহ-ভোগাকাঙ্ক্ষা-সব কেমন নিষ্ফল শূন্য। এই বিশাল পৃথিবীতে সবই কেমন বানানো, কৃত্রিম মনে হয়। আর এই অভিজ্ঞতার অন্তস্থল থেকে উঠে আসে নন্দর প্রতি কিছুকাল আগের সম্পর্কের এক মানবতাবোধ। তা করুণ, দুঃখময়, বেদনাময় হলেও একান্ত সত্য।

গল্পের অন্যান্য চরিত্র – হিমু, বেদানামাসি, আতা নামের বেশ্যারা আঙুরের প্রয়োজনে যেমন আসছে, তেমনি বেশ্যা চরিত্রের স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় জীবন্ত হয়ে আসে। নন্দ, প্রভুলাল, বিশুর মতো চরিত্রও বেশ্যাপল্লীতে বিশেষ উদ্দেশ্যে যাতায়াতের উপযোগী চরিত্র। এরা একটা টাইপের মধ্যে পড়ে যায়। এমনকি মানিক মুন্সীর মতো সুবিধাভোগী গ্রাম্য মিউনিসিপ্যালিটির

রাজনীতির সঙ্গে জড়িত মানুষও স্বার্থসর্বস্বতার গন্ডিতে আঙুরের চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিকত্ব পেয়েছে। এরা সমবেতভাবে আঙুরেরই নতুন জীবন-উপলব্ধির সহায়ক সক্রিয়তায় গল্পে স্থান গ্রহণ করেছে। বিমল কর নায়িকা চরিত্রভাবনায় যত বেশি অন্তর্মুখিন হয়েছেন, যতটা মনের গভীরের অভিজ্ঞতায় চরিত্রে রক্ত-মাংস-মজ্জা-প্রাণের সন্ধিৎসু হয়েছেন, তাতে তাঁর একান্ত নিজস্বতা অস্বীকার করার নয়।

গল্পের নাম যখন আঙুরলতা এবং এই নামের চরিত্রই যখন গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য, তাই নামের অনুষঙ্গে সমগ্র গল্পটি যে এক বারবণিতার গল্প, তা স্পষ্ট হয়ে যায় নামেই। গল্পের নিগূঢ় তাৎপর্যের দিকে লক্ষ রেখে হয়তো অন্য কোনো নাম হতে পারত, কিন্তু লেখক তার মধ্যে যাননি। তিনি নামকে কেন্দ্রীয় চরিত্র-মুখ্য করে গল্পের বিষয়-ভাবনাকেও স্পষ্ট, বাস্তব সত্যের সীমায় রেখেছেন। আঙুরলতা সমস্ত বেশ্যাদের প্রতিনিধিত্ব করে যেমন, তেমনি তার উপলব্ধি বিশেষ বেশ্যার জীবন থেকে সরে এসে সর্ব-মানবের জীবন-সত্যে নিয়ে যায়। তাই আঙুরলতা বিশেষ হতে পারে, কিন্তু তাৎপর্যে সে সর্বকালের নারীই।

টিপ্পনী

□ আপ ট্রেন
রমাপদ চৌধুরী

'আপ ট্রেন' গল্পের কথক স্বয়ং লেখক। উত্তম পুরুষ কথন রীতিতে গল্পটি উপস্থাপন করা হয়েছে। আপাত নিরীহ একটি গল্পের আড়ালে লুকিয়ে আছে আছে অন্য একটি গল্প। গল্পটি শুরু হয়েছে শহরের আঁকাবাঁকা গলি ঘুরে অন্ধকারে অচেনা রাস্তা পেরিয়ে স্টেশনের সন্ধানের মধ্য দিয়ে। গল্পটি ক্রমশ এগোতে এগোতে আমরা বুঝতে পারি গল্পকথক আসলে জীবনের অন্ধকার স্বরূপ প্রতিবন্ধকতাগুলি অতিক্রম করে সাফল্যলাভের মূল লক্ষ্যে পৌঁছনোর কথা বলেছেন। আর এই সাফল্য লাভের উপায় কী হবে এবং সাফল্যের মানদন্ডই বা কী এসব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের মনে জাগতে শুরু করে। গল্প কথকের মতোই অধিকাংশ মানুষই কোনো সুনির্দিষ্ট সাফল্য লাভে সন্তুষ্ট নয় এবং সাফল্য লাভের জন্য সহজতম ও সংক্ষিপ্ত রাস্তাই বেছে নেয়। যেন তেন প্রকারে সাফল্য লাভ-ই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। তার জন্য আত্মসম্মানবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে কৃত্রিম বিনয়কে অবলম্বন করে তোষমোদ প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে সাফল্য লাভই তার কাছে শেষ কথা। সমাজের মেরুদন্ডহীন সরিসৃপ জাতীয় সেইসব মানুষদের চরিত্রকে উন্মোচন করা হয়েছে গল্পকথকের মধ্য দিয়ে।

গল্পের শুরুতে গল্প কথক স্টেশনে পৌঁছনোর রাস্তা জানতেন না। পরে অনেক ট্রেন ফেল করেছেন। অর্থাৎ জীবনে অনেক সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। এবারে যেন তেন প্রকারে ট্রেনে উঠতেই হবে। আর তার জন্য জনৈক ভদ্রলোককে তোষামোদ করে তার সুপারিশ আদায় করে নিতে হবে। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে তিনি সেই ভদ্রলোককে তোষামদ করে যাচ্ছেন। মেরুদন্ড বেঁকে গেলেও কোনো দ্বিধা নেই। বিজ্ঞ মানুষের উপদেশ মনে পড়ে যায় তাঁর। হোমো স্যাপিয়েন প্রথম মানুষটি দুপায়ে ভর দিয়ে মেরুদন্ড সোজা করেই দাঁড়িয়েছিল সাফল্যকে গাছ থেকে পেড়ে নেবে বলে। কিন্তু পারে নি। আর তাই সাফল্য লাভ করতে হয়ে তথাকথিত সভ মানুষদেরও মেরুদন্ড সোজা রাখবার উপায় নেই। ভদ্রলোকের সুপারিশের চিঠি হাতে পেয়ে কৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধায় একটা প্রণামি করলেন। এরপর অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন। যে রিক্শা ধরে অজানা

গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হলেন সেই রিক্‌শাওয়ালার মেরুদন্ড বরং সোজা ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি স্টেশনে পৌঁছলেন।

স্টেশনের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো গির্জাটা সিল্যুট ছবির মতো একটা মেরুদন্ড সোজা করা মানুষ হয়ে আকাশের দিকে তর্জনী তুলে দাঁড়িয়েছিল। গল্পকথকের সেদিকে তাকানোর সময় নেই। রিক্‌শা থেকে নামতেই চোখে পড়ল একটি মেয়ে বড়ো বড়ো চোখ মেলে গির্জাটার দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁর মনে হয়েছে মেয়েটি গির্জার ঘড়িটা দেখছে। কিন্তু না, মেয়েটি তাকিয়েছিল যিশুর দিকে। আর তাই অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো 'কী সুন্দর! কী সুন্দর!' গল্পকথকের হাজার ব্যস্ততা থাকলেও মেয়েটির কোনো ব্যস্ততা ছিল না। ট্রেন ধরার জন্য যখন সবাই দৌঁড়চ্ছে, তখন স্টেশন স্বরূপ সাফল্য পেয়ে গল্পকথকও ট্রেন ধরার জন্য ছুটতে লাগলেন। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটার মতো ধৈর্য তাঁর ছিল না। শেষ পর্যন্ত নিয়ম ভেঙেই অনেকের আগে টিকিট কেটে ট্রেনে ওঠার জন্য ছুটলেন। এর আগে অনেকবার লাইনে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু তাঁর পালা আসেনি। সাফল্য পাননি। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা-ধাক্কি করে শেষ পর্যন্ত ট্রেনে উঠেছেন। কিন্তু ট্রেনে উঠেও তিনি সন্তুষ্ট নন। কারণ প্রচন্ড গরমে, ঘামের গন্ধে ভিড়ের মধ্যে এক অসহ্যকর পরিস্থিতি। যে লোকগুলি বসেছিল তাদের ওপর তাঁর রাগ হচ্ছিল। একজনকে একটু সরে বসতে বললে কোনরকমে সেই ফাঁকা জায়গায় তিনি বসে পড়লেন। এবং যে লোকটি সরে জায়গা করে দিয়েছিলেন, তাকেই চাপতে শুরু করলেন। জীবনের ক্ষেত্রেও এমন পরশ্রীকাতরতাও অকৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিন্তু সেই বসাতেও তাঁর তৃপ্তি হয়নি। একজন লোক উঠে যেতেই তিনি আরাম করে বসলেন। পাশাপাশি সজাগ দৃষ্টি, যাতে আর কেউ বসে না যায়। ট্রেন ধরতে পেরেছেন, বসতে পেরেছেন বলে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে তাঁর। বসতে পেরেও সন্তুষ্টি নেই সামনের বেঞ্চে যে লোকটার ওপর পাখাটা ঘোরানো ছিল তার প্রতি ঈর্ষা জাগল। এরপর মনে মনে সেই সিটটা পেতে চাইলেন। কারণ ওখানেই আনন্দ-আরাম ও সচ্ছলতা বেশি। তাঁর ভালোবাসা ঝুমঝুমিও চেয়েছিল তাঁর উন্নতি। তিনি ওপরে উঠবেন এটাই ছিল প্রত্যাশা। সামনের বেঞ্চের একটি লোক উঠে যেতেই যিনি পাখার হাওয়া খাচ্ছিলেন তাঁকে পাশে সরিয়ে দিয়ে গল্প-কথক সেখানে বসে গেলেন। তাঁর মনে হলো এবার তিনি মেরুদন্ড সোজা করে বসতে পারবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে জানালার ধার ঘেঁষে বসে থাকা লোকটির দিকে নজর গেল। লোকটা বাইরে জানালা দিয়ে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে, অনেক কিছু উপভোগ করছে, ঠান্ডা বাতাস পাচ্ছে। তাঁর মনে হলো সেখানে বসলেই জীবন ধন্য হয়ে যাবে। এই কামরার শ্রেষ্ঠ আসনে বসার ইচ্ছা জাগল। ঝুমঝুমি বলেছিল ওপরের গোলপোস্টটা ছুঁতে পারাই বড়ো নয়, ওপরে ওঠাটাই বড়ো। ঝুমঝুমিকে তিনি আপন করে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে ভেবেছিল তাঁর প্রতিশ্রুতি মিথ্যে। আর তাই, তিনি আজ সাফল্যের শিখরে, ঝুমঝুমি অনেক নিচে।

জানালার পাশে বসে থাকা লোকটা উঠতেই তিনি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সেই সিটে বসে পড়লেন। তাঁর মনে হতে লাগল ঃ

"সাফল্য এখন আমার হাতের মুঠোয়। ঝুমঝুমি, তুমি দেখে যাও আমি এখন কেমন মেরুদন্ড সোজা করে বসে আছি। ভিতরে ভিতরে আমি যদি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়ে থাকি, যদি বুকের মধ্যে চতুষ্পদ কিংবা সরীসৃপ, সে শুধু আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি, পাব, কিন্তু তুমি দেখে যাও আমি কত ওপরে উঠেছি, কত ওপরে।"

টিপ্পনী

পরম নিশ্চিন্তে বাইরে তাকাতেই তিনি মুষড়ে পড়লেন। কারণ কিছুই দেখার নেই, চারিদিকে শুধু অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে তিনি একা এবং শূন্য। তাঁর কোনো সঙ্গী নেই। জানালার পাশটিতে পৌঁছতে গিয়ে কামারার প্রত্যেকটি মানুষকে তিনি হারিয়েছেন। তাঁর জন্য এখন আর কারো সহানুভূতি নেই, সমবেদনা নেই। প্ল্যাটফর্মে তিনি একা। ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। হেঁটে যেতে যেতে তাঁর মনে হতে লাগল ঃ "সমস্ত শরীরটা যেন দুপায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। আমি কেমন সামনে ঝুঁকে পড়ে নুয়ে-পড়া একটা ভারী মেরুদন্ড বয়ে নিয়ে চলেছি, একা এবং সম্পূর্ণ একা।"

টিপ্পনী

গির্জায় যিশুর দিকে তাকিয়ে থাকা মেয়েটির অভাববোধ করছেন তিনি। আকাশের দিকে তাকিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও গির্জার চূড়াটা তর্জনী তুলে যা দেখাচ্ছিল তার কিছুই দেখতে পেলেন না।

'আপ ট্রেন' গল্পের ট্রেন আসলে কোনো ট্রেন নয় - জীবনপথ। এ ট্রেনের গন্তব্য জীবনের লক্ষ্য। ট্রেনের সুবিধা পাওয়া জীবনে সাফল্য পাওয়ার সামিল। ওপরে উঠার নেশায় মানুষ মানুষের থেকে কীভাবে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় - হয়ে যায় নিঃসঙ্গ ও একাকী - এ গল্প সেই জীবনের আলেখ্য। উন্নতিলাভের অন্ধ নেশায় মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসলে আমরা যে গন্তব্যেই পৌঁছই না কেন সেটা কখনো চরম লক্ষ্য হতে পারে না। আর তাই একরাশ শূন্যতা ও নিবিড় একাকীত্বই হয় মানুষের একমাত্র প্রাপ্তি।

□ আদার

সমরেশ বসু

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯৩৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর এবং চলে ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর সময় পরিধি ধরে। এই ছ'বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস বিচিত্র। ১৯৪৩-এর মহামন্বন্তর এই সময়ে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সামনে আনে সাধারণ শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের। মন্বন্তরের পর রাজনীতির চালে ও কৌশলে সামনে আসে মুসলমানদের ডাকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবসের (১৯৪৬, ১৬ আগস্ট) পরিবেশ যার মধ্যে প্রধান হয় হিন্দু মুসলমানের রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেই দাঙ্গার প্রত্যক্ষ চিত্রের অমানবিক জীবন্ত বাস্তব রূপ মনে রেখে সমরেশ বসু 'আদাব' গল্পটি লেখেন।

গল্পকার দাঙ্গার বাস্তব চিত্রের প্রেক্ষিত এঁকেছেন গল্পের শুরুতে। শহরে দাঙ্গা থামাতে নেমেছে শাসক ব্রিটিশের মিলিটারি টহলদার গাড়ি। এর মধ্যে আছে প্রশাসকের জারি করা কারফিউ। হিন্দু-মুসলমান -উভয় সম্প্রদায়ই নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত। সুযোগ-সুবিধা বুঝে গুপ্তঘাতকরাও সন্ত্রস্ত। লুঠেরাদের তৎপরতার বিরাম নেই। দাঙ্গাকারীদের উল্লাস, বস্তিগুলিতে আগুন, নারী-শিশুদের বীভৎস চিৎকার, সৈন্যবাহিনীর আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অবিরল গুলিবর্ষণ - এসবের পরিবেশে এক রুদ্ধশ্বাস অবস্থা।

এই অবস্থায় পরস্পর বিপরীত দু'দিক থেকে দুটি গলির দুটি মুখ যে বড়ো একটি জায়গায় মিশেছে, সেই মোড়ে দুজন ভীতসন্ত্রস্ত লোক পড়ে-থাকা এক ডাস্টবিনের আড়ালে চলে আসে নিঃসাড়ে। দুজনেই পরস্পরের আড়ালে বেশ কিছু সময় নীরব থাকে। ভয়-পরস্পরকে কোন

জাতি ও ধর্মের! দুজনেই সন্দেহ করে - তাদের কে হিন্দু, কে মুসলমান - এমন ভীত-স্বর জিজ্ঞাসা দিয়ে। ক্রমশ সাহস একটু এলে দুজনের পরিচয় দুজন জানতে পারে তাদের পেশা দিয়ে। একজন নৌকার মাঝি, আর একজন সূতাকলের শ্রমিক। নিজেদের ধর্মের নামে এই দাঙ্গাকে ঘৃণা করে দুজনই। পরস্পরের অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠার স্থির স্বভাবের মধ্যে নেশার জিনিস বিনিময় করে, কাছের হয়ে যায়। পরে ওরা বুঝে যায় নৌকার মাঝি হলো মুসলমান, আর সূতাকলের শ্রমিক হলো হিন্দু। আপন অন্তরঙ্গ কথার মধ্যে মাঝি কাল ঈদ থাকায় মেয়ের জন্য দুটো জামা, একটা শাড়ি কিনেছে। যদি এখানেই দাঙ্গায় মারা যায় সে তবে বাড়ির অবস্থা হবে করুণতম, শোচনীয়। সূতাকলের শ্রমিকও তার পারিবারিক অসহায়তার কথা অকপটে জানায়।

টিপ্পনী

দাঙ্গা, ব্যবসার ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ সামান্য দূরে পুলিশ টহলদারির বুটের শব্দ কানে এলে ওরা নিজের নিজের মতো লুকিয়ে পড়ে, সেখান থেকে পালাবার পথ খোঁজে। ওরা এক সময় মুসলমানদের এলাকার কাছে এলে নৌকার মাঝি যুক্তি দেয়, সূতাকলের শ্রমিক বরং লুকিয়ে থাকুক এখানে, ভোরে বাড়ি ফিরবে। কারণ এই মুসলমান এলাকায় তার যাওয়া ঠিক নয়, নিরাপদও নয়। মাঝি নিজে বরং যেভাবে হোক বুড়ি গঙ্গা নদী সাঁতরে পার হয়ে ওর বাড়ি যাবে। ঈদের দিনে বাড়ি ফিরলে বিবির চোখের জল মোছাতে পারবে। সূতাকলের শ্রমিক সমবেদনায়, ভয়ে তাকে যেতে বারণ করলেও মাঝি শোনে না। দুজনের সম্পর্কের গভীর অনুকম্পার, সমবেদনার সম্পর্কের মধ্যে নৌকার মাঝি শুভ বিদায় জানিয়ে এক সময় চলে যায়। সূতাকলের শ্রমিক মাঝিকে নিয়ে দুর্ভাবনায় বুক-ভরা উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করে। হঠাৎ শুনতেপায় পুলিশ দৌড়তে দৌড়তে গুলি ছোঁড়ে ডাকাতের দিকে।

লুকিয়ে থেকে সূতাকলের শ্রমিক কল্পনা করে নৌকার মাঝির কথা। যদিও অনেক্ষণ আগে চলে গেছে মাঝি, তবু সন্দেহ হয় সূতাকলের শ্রমিকের, মাঝি হয়তো ফিরতে পারেনি। তার গুলি খাওয়া বুকের রক্তে ভেসে গেছে মেয়ে ও বিবির সব পোশাক। সে যেন সেই কথাই গভীর আক্ষেপে বেদনায় সকাতরে সূতাকলের শ্রমিককে জানাচ্ছে। এই অন্তিম স্বপ্নচিত্র দিয়েই গল্পের সমাপ্তি।

'আদাব' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য সমকালের অন্ধ-সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার নিষ্ফলত্ব ধরে, চিরকালের সত্যকে শিল্পময় করে সর্বকালের পাঠকদের অভিজ্ঞতার অনুবর্তী করার প্রয়াস। বিশ শতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষের এক বছর পরে ১৬ আগস্ট তৎকালীন মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে'র নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে কোলকাতা সহ সারা বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে। তারই 'victim' হতে চলে 'আদাব' গল্পের দুই অতি সাধারণ মানুষ -দুই জাতের মুসলমান-নৌকোর মাঝি ও হিন্দু-সূতাকলের শ্রমিক। এদের পরস্পরের অচেনা স্বভাব থেকে চিরকালীন মানবজীবন ও স্বভাবে, প্রায় দীক্ষিত হওয়ার শিক্ষা-চিত্রই কেন্দ্রীয় বক্তব্যের লক্ষ্যে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

বিশ শতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন ব্যাপক ধ্বংসের, মানুষ মারার পরিবেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সমরেশ বসু মানুষের কথাই বলেছেন তাঁর এই গল্পে। 'আদাব' গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য মানবতা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তার সূত্র ধরে মানুষের মধ্যে হিংসা, ঘৃণা, ভয়, সন্দেহ - এই বৃত্তিগুলি চারিত্রের মধ্যে অন্তঃশীল রেখে তার থেকে উত্তরণে চরিত্রদের উপস্থাপন করেছেন গল্পকার। কিন্তু সমকাল থাকলেও সমসাময়িক রাজনীতিকে সুকৌশলে পাশে সরিয়ে রেখেছেন

শিল্প-সংযমের দাবি মেনে।

সমরেশ বসুর 'আদাব' হলো বিশুর মানবিকতাবোধে দীপ্ত মানবপ্রাণের গল্প ছবি। সম্পূর্ণ মেদবর্জিত তীক্ষ্ন, তীব্র স্বভাবের গল্পটির কায়া এক ভিন্ন মাপে রচিত হয়েছে। তাই ক্লাইম্যাক্স এখানে ঘটনাশ্রয়ী নয়, বরং সংলাপ ও দুই চরিত্রের মধ্যবর্তী প্রতিক্রিয়া নির্ভর চিন্তাশ্রয়ী। গল্পে যে গতির একমুখিতা আছে, তা লেখক-চিন্তিত কেন্দ্রীয় বক্তব্যের দিকে স্থির নিবদ্ধ। গল্পের ভাষাপ্রয়োগ হয়েছে সংযত, গল্পের নাম কেন্দ্রীয় বক্তব্যের ব্যঞ্জনার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। সব মিলিয়ে গল্পটি অসামান্য শিল্পরূপ লাভ করেছে।

টিপ্পনী

□ তৃণভূমি

সাধন চট্টোপাধ্যায়

যন্ত্র-সভ্যতার ক্রমবর্ধমান উন্নতি মানুষের জীবন ও জীবনচর্যার আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। আর এই পরিবর্তনের হাত ধরেই মানুষের শরীরে ও মনে বাসা বেঁধেছে নানা ধরনের অসুখ। মানুষ হারিয়ে ফেলেছে মাথার ওপর খোলা আকাশ আর পায়ের নিচের সবুজ তৃণভূমি। কংক্রিটের অচলায়তনে মানুষ নিজেকে করেছে অবরুদ্ধ। আর তাই মানুষ নিয়ম করে সকালে-বিকেলে অথবা মাঝে মাঝেই তৃণভূমিতে পা রাখতে বেরিয়ে পড়ে।

'তৃণভূমি' গল্পের নায়ক নির্মলেন্দু ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার আগেই দেখতে পায় নানা মানুষজন তৃণভূমির উদ্দেশে রওনা হয়েছে। ভোরবেলা দু-একটি অটোর ধোঁয়া নির্মলেন্দুর ফুসফুসে ঢুকে পড়লে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে। এর মধ্যেই তার লক্ষ যায় কয়েকটি কুকুরের ওপর। এই কুকুর তার কাছে ভারী বিস্ময়ের। কারণ রাস্তাঘাটে কামরের ভয়, আবার এদেরই পূর্বপুরুষ যুধিষ্ঠিরের মহাযাত্রার সর্বশেষ সাথী হয়েছিল। সেই যাত্রাপথে ছিল না লোভ, ঈর্ষা ও সংকীর্ণতা।

নির্মলেন্দু যে মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সেই মাঠটি যেমন বিস্তৃত, তেমনি মসৃণ। ভোরের বাতাস, ফুটবল-ক্রিকেট খেলা, রাজনৈতিক সভা সব এই তৃণভূমিকে আশ্রয় করেই। কংক্রিটের শহরে এই তৃণভূমি যেন একটি টবের ফুল হয়ে আছে। এই মাঠে দাঁড়িয়েই সে দেখতে পায় সাত-আট বছরের একটি মেয়ে মায়ের পিছু পিছু বৃত্তাকারে ঘুরে যাচ্ছে। ছোট্টো মেয়েটির হার্টের অসুখ। মায়ের ধারণা ভোরের বাতাস বুকে গেলে সে সেরে উঠবে। অন্যদিকে এক বৃদ্ধা বাতের ভারে কিছুটা হেঁটেই বিশ্রাম নিচ্ছে। তার পাশে 'পোয়াতি' পুত্রবধূ। এরই মধ্যে যে ছোটো মেয়েটি মাকে অনুসরণ করে প্রদক্ষিণ করছিল সে হঠাৎ পড়ে যায়। এতদূর থেকে বোঝা না গেলেও মেয়েটি যে নড়ছে না তা নিমর্লেন্দু বুঝতে পারে।

এদিকে ক্রিকেট খেলা চলছে - চিৎকার চেঁচামেচি চলছে। তিনটে কাঠির স্টাম্প, ব্যাট এবং প্লাস্টিকের শক্ত বল - হলুদ রংয়ের। বলটি ব্যাটের গায়ে লেগে ওপরে উঠতেই চিৎকার শুরু হয় 'ক্যাচ! ক্যাচ পল্টু!' কিন্তু পল্টু ক্যাচটি ধরতে পারে না। মাঠের আর এক দিকে তিনটি মহিলা বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণ করছে - শরীরে কসরৎ করছে। শরীর চর্চার সময় তারা কথা বলে না। তারপর ক্লান্ত হয়ে গেলে মাঠের কোনে যে পুকুর আছে তার জল দেখে এবং কিছুক্ষণ নীরবতার পর দৈনিক সংসারের গল্প শুরু করে। নন্দু, অ্যালসেশিয়ান হাতে নিয়ে ভদ্রলোকের

হাঁটা এসব চলতে চলতে হঠাৎ চিৎকার শুরু হতেই নির্মলেন্দু সেদিকে নজর দেয়। একটি কুকুর ময়লাস্তুপের ওপর একপাটি হাওয়াই চটি কামড়ে ছুটছে। ওদিকে মোটা 'বেতো শাশুড়ি' হায় হায় করতে করতে জানায় – 'এক্কেবারে নতুন। মাত্তর ২০ দিন আগে অনেক দামে কিন্যা দিছি বউমারে।' মাঝারি বয়সের এক ভদ্রলোক দুটো বড়ো ঢেলা কুড়িয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। কিন্তু দূর থেকে ঢিল ছুড়লে কুকুরটি ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

টিপ্পনী

অন্যদিকে 'ক্যাচ ইট পল্টু' আওয়াজ শুনেই নির্মলেন্দু খেলার দিকে ফিরে তাকালেন। দেখলেন 'বল্লেবাজ ১৫' ছেলেটি এমনভাবে ব্যাট হাঁকিয়েছে, যে বল শূন্যে উঠে গেছে। পল্টু সেই ক্যাচ ধরার জন্য তৈরি। কিন্তু বল আর পৃথিবীর টানে নিচে নেমে আসছে না। নীল আকাশে হলুদ বল কোথায় যেন লুকিয়ে গেল। শুধু পল্টু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তার স্বপ্নের ক্যাচের জন্য। এভাবেই পল্টুর মতো ছেলেদের স্বপ্ন হারিয়ে যায়। ওদিকে এক প্রেমিকযুগল শরীরে রক্ত চলাচল পরিপূর্ণ সতেজ বানিয়ে তৃণভূমি ছেড়ে বাড়ির পথে পা বাড়ায়।

অনেকেই তৃণভূমি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। কারণ রোদে ঘাসের মধ্যে শরীরে 'কুট কুট' ভাব জাগায়। পুকুরের ভাঙা প্রাচীন ঘাটে বৃদ্ধদের দল আস্তে আস্তে উঠে আসে। রাস্তার উঠবার মুখে শেষ তিনটি মানুষও উঠি উঠি করছে। নির্মলেন্দু বেরিয়ে এলেন। সারাদিন বৃষ্টি ও দুপুরের গুমোট ভাবের পর বিকেল পাঁচটায় সব শান্ত হয়ে উজ্জ্বল হলুদ আলো ফুটলো পশ্চিম আকাশে। এরপর গোধূলির সময়। এই সময়ে তৃণভূমিতে বিশেষ কেউ থাকে না। কিন্তু নির্মলেন্দু মাঝে মাঝে চলে আসেন – আনমনা ঘুরে বেড়ান। আজও কিছুটা সময় মাঠের ভিতর দাঁড়ালেন। কিছুটা সময় পারচারি করলেন চারপাশে। হঠাৎ তার নজর পড়ল ঘাসের ওপর একজোড়া অক্ষত হাওয়াই চটি। জুতোর চারপাশ ঘিরে সকলের না পাওয়া ব্যাথার ধুলো জমে আছে। নির্মলেন্দু যেন দেখতে পেলো 'খুঁতো হৃৎপিন্ডের' শিশুটি হঠাৎ ঘসে থেকে উঠে ধীর পায়ে ভয়ে-ভয়ে পাক খাওয়ার চেষ্টা করছে এবং কাউকে দেখতে না পেয়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে। চারিদিক দেখে নির্মলেন্দু আত্মগত ভাবনায় নিজেকে ভ্রুণে রূপান্তরিত করলেন। নিজেকে ভ্রুণে রূপান্তরিত করলেন। নিজেকে ফের একজন পরিণত বৃদ্ধে ফিরিয়ে দিতে ভয় লাগল তার। এরপর সন্ধ্যা গাঢ় হলেই এই মাঠে অসামাজিক কার্যকলাপ শুরু হয়ে যায়। তাই সে বেরিয়ে এল। একেবারে সোজা, সংক্ষিপ্ত পথ ধরে আলোর আভাসে চলে এলেন। এবং পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেলেন তিনিও বহু মানুষের চলা-অভ্যাস বশত 'ছিলার' চিহ্ন ধরেই এসেছেন অজান্তে। অন্যদিকে চটি-কামড়াবো ময়লা কুকুরটা নিঃশব্দে সঙ্গী হয়েছে। অনেকটা পথ হেঁটে সে এখন থমকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। সমস্ত জগত নির্মলেন্দুর কাছে স্থির হয়ে রইল।

তৃণভূমি ঘিরে মানুষের যে নিত্য যাত্রা তা কোনো একক মানুষের জীবনচর্যা নয়, তা বহু যুগ ধরে চলে আসা মানুষের আঁকাবাঁকা পথে প্রবহমান জীবনের আখ্যে।

গ্রন্থ ঋণ

১. অজিত কুমার ঘোষ ঃ ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস’, দে’জ পাবলিশিং কল-৭৩, ৭ম সং, আগস্ট ১৯৮৫

২. উত্তম দত্ত ঃ ‘সতীনাথের জাগরী ঃ মননে দহনে অনুভবে’, কল্যাণী পাবলিকেশন, মালদহ আগস্ট ২০০৭

৩. জগদাশ ভট্টাচার্য ঃ ‘আমার কালের কয়েকজন কবি’, ভারবি, কল-৭৩, আগস্ট ২০০৪

৪. দর্শন চৌধুরী ঃ ‘টিনের তলোয়ার নিয়ে’, পুস্তক বিপণি, কল-৯, নভেম্বর ২০১০

৫. দীপ্তি ত্রিপাঠি ঃ ‘আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়’, দে’জ পাবলিশিং, কল-৭৩, জুলাই ২০০৩

৬. বীরেন্দ্র দত্ত ঃ ‘বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ’, পুস্তক বিপণি, কল-৯, ৫ম সং, জুলাই ২০০৪

৭. বুদ্ধদেব বসু (সম্পা.) ঃ ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কল-৭৩, জুলাই ১৯৯৮

৮. শীতল চোধুরী ঃ ‘জীবনানন্দ অন্বেষা’, সাহিত্যশ্রী, কল-৯, জানুয়ারি ১৯৯২

৯. সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ ‘জাগরী’, প্রকাশ ভবন, কল-৭৩, কার্তিক ১৪০৫

১০. সরোজমোহন মিত্র ঃ ‘রবীন্দ্রোত্তর ছোটগল্প সমীমক্ষা’, গ্রন্থ বিকাশ, কল-৭৩, আশ্বিন ১৪১২

১১. সৌমি দাশ (সম্পা.) ঃ ‘জাগরী ঃ আত্মদীপ অগ্নিমান’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কল-৯, বইমেলা ২০০৮

টিপ্পনী

NOTES

NOTES

NOTES